কবিতা সমগ্র

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতিভাস প্রকাশন

কবিতাসমগ্র

২

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯২ মুদ্রণ সংখ্যা ৩৩০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ১৯৯৭ মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০

ISBN 81-7215-090-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৫০·০০

ভূমিকা

আমার কবিতাসমগ্রের দ্বিতীয় খণ্ডে ছোট ছ'টি গ্রন্থের কবিতা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থগুলি কালানুক্রমিক কিন্তু প্রতিটি কবিতা সে রকম নয়। আমার যাবতীয় প্রকাশিত কবিতাই কাব্যগ্রন্থে স্থান পায় না। এই ছটি বই প্রকাশ করার সময় আমার আরও বেশ কিছু কবিতা আমি নিজেই বর্জন করেছি, সেগুলি এখন আর খুঁজে পাবার উপায় নেই।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গ্র ন্থ সূ চি

দাঁড়াও সুন্দর ১৩
মন ভালো নেই ৪৭
এসেছি মেব পিকনিকে ৯১
দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায় ১৩৩
স্বর্গ নগরীর চাবি ১৭৩
সোনার মুকুট থেকে ২১৩

কাব্যপরিচয় ২৪১
প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি ২৪৩

দাঁড়াও সুন্দর

সূচিপত্র

নদীর পাশে আমি ১৩, ভালোবাসার পাশেই ১৩, শিল্পী ফিরে চলেছেন ১৪, একটি শীতের দৃশ্য ১৫, একটি কথা ১৬, নিজের আড়ালে ১৬, নারী ১৭, আছে ও নেই ১৮, কথা ছিল ২০, আমি নয় ২১, মায়া ২২, অন্যরকম ২২, স্মৃতি ২৩, পৃথিবী ও আমি ২৩, অনেক দূরে ২৪, চায়ের দোকানে ২৫, নিশির ডাক ২৫, জন্মান্ধের গান ২৬, দুই বন্ধু ২৭, সিংসাহনে ঘুণ পোকা ২৮, উপত্যকার পাশে ২৯, নারী কিংবা ঘাসফুল ২৯, চরিত্র বিচার ৩০, এখন একবার ৩১, একবারই জীবনে ৩১, অতৃপ্তি ৩২, তোমাকে ছাড়িয়ে ৩২, নারী ও শিল্প ৩৩, প্রেমিকা ৩৪, সময় খোলেনি ৩৪, স্বর্গের কাছে ৩৫, মুক্তো ৩৫, চাবি ৩৬, শরীর ৩৭, শুয়ে আছি ৩৮, মহতের কাছে ৩৮, দেখি মৃত্যু ৩৯, নাম নেই ৪০, ভুল সময়ে ৪০, শহরের একটি দৃশ্য ৫১, উৎসব শেষে ৪৪

নদীর পাশে আমি

নদীটির স্বাস্থ্য ছিল ভালো, এবং সন্ধ্যার আগে
মিশে ছিল ফিকে লাল রং
হঠাৎ বনের পাশে সে আমাকে একটুখানি
চমকে দেয়
যেন সুখে শুয়ে আছে একাকী কিন্নরী
আমি তার রূপের তারিফ করে
বলে উঠি, বাঃ !

এবং নারীর ওষ্ঠে চুম্বন করার মতো
আমি তার জল ছুঁই
চোখে মুখে ঝাপটা দিই
তাকে নিয়ে খেলা করি অত্যন্ত আদরে
দু'পাশের গাছপালা এবং আকাশ তার
সাক্ষী হয়ে থাকে।

তবু এর শেষ নেই, এখানেও শেষ নেই,
এই স্বাস্থ্যবতী নদীটিকে
বনের কিনারা থেকে ছাপার অক্ষরে যতক্ষণ
তুলে আনতে না পারি, বা
স্মৃতি থেকে ছন্দ-মিলে গেঁথে রাখা যায়
ততক্ষণ শান্তি নেই, ততক্ষণ নদীপ্রান্তে নির্বাসিত আমি।

ভালোবাসার পাশেই

ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে
ওকে আমি কেমন করে যেতে বলি
ও কি কোনো ভদ্রতা মানবে না ?
মাঝে মাঝেই চোখ কেড়ে নেয়,
শিউরে ওঠে গা
ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে।

দু'হাত দিয়ে আড়াল করা আলোর শিখাটুকু
যখন তখন কাঁপার মতন তুমি আমার গোপন
তার ভেতরেও ঈর্ষা আছে, রেফের মতন
তীক্ষ্ণ ফলা
ছেলেবেলার মতন জেদী
এদিক ওদিক তাকাই তবু মন তো মানে না
ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে।

তোমায় আমি আদর করি, পায়ের কাছে লুটোই
সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে আগুন নিয়ে খেলি
তবু নিজের বুক পুড়ে যায়, বুক পুড়ে যায়
বুক পুড়ে যায়
কেউ তা বোঝে না
ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে।

শিল্পী ফিরে চলেছেন

শিল্পী ফিরে চলেছেন, এ কেমন চলে যাওয়া তাঁর ?
এমন নদীর ধার ঘেঁষে চলা,
যেখানে অজস্র কাঁটাঝোপ
এবং অদূরে রুক্ষ বালিয়াড়ি,
ওদিকে তো আর পথ নেই
এর নাম ফিরে যাওয়া ? এ তো নয় শখের ভ্রমণ
রমণীর আলিঙ্গন ছেড়ে কেন সহসা লাফিয়ে ওঠা—
কপালে কোমল হাত, টেবিলে অনেক সিক্ত চিঠি
কত অসমাপ্ত কাজ, কত হাতছানি
তবু যেন মনে পড়ে ভুল ভাঙবার বেলা এই মাত্র
পার হয়ে গেল !

বুকে এত ব্যাকুলতা, ওষ্ঠে এত মায়া
তবু ফিরে যেতে হবে, ফিরে যেতে হবে
এর নাম ফিরে যাওয়া ? এ তো নয় শখের ভ্রমণ
ওদিকে তো আর পথ নেই

অচেনা অঞ্চলে কেউ ফেরে ? যাওয়া যায় । ফেরে ?
এর চেয়ে জলে নামা সহজ ছিল না ?
সকলেই বলে দেবে, শিল্পী, আপনি ভুল করেছেন
অতৃপ্ত, দুঃখিত এক বৃহত্তম ভুল ।

একটি শীতের দৃশ্য

মায়া মমতার মতো এখন শীতের রোদ
মাঠে শুয়ে আছে
আর কেউ নেই
ওরা সব ফিরে গেছে ঘরে
দু'একটা নিবারকণা খুঁটে খায় শালিকের ঝাঁক
ওপরে টহল দেয় গাংচিল, যেন প্রকৃতির কোতোয়াল ।

গোরুর গাড়িটি বড় তৃপ্ত, টাপু টুপু ভরে আছে ধানে
অন্যমনা ডাহুকীর মতো শ্লথ গতি
অদূরে শহর আর ক্রোশ দুই পথ
সেখানে সবাই খুব প্রতীক্ষায় আছে
দালাল, পাইকার, ফড়ে, মিল, পার্টি, নেকড়ে ও পুলিশ
হলুদ শস্যের স্তূপে পা ডুবিয়ে
ওরা মল্লযুদ্ধে মেতে যাবে
শোনা যাবে ঐকতান, ছিঁড়ে খাবো চুষে খাবো
ঐ লোকটিকে আমি তোমাদের আগে ছিঁড়ে খাবো ।

সিমেন্টের বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছে সেই লোকটা
বিড়ির বদলে সিগারেট
আজ সে শৌখিন বড়, চুলে তেল, হোটেলের ভাত খেয়ে
কিনেছিল এক খিলি পান
খেটেছে রোদ্দুরে জলে দীর্ঘদিন, পিতৃস্নেহ
দিয়েছিল মাঠে
গোরুর গাড়ির দিকে চোখ যায়, বড় শান্ত এই
চেয়ে থাকা
সোনালী ঘাসের বীজ আজ যেন নারীর চেয়েও গরবিনী

সহস্র চোখের সামনে গায়ে নিচ্ছে
রোদের আদর
এখনই যে লুট হবে কিছুই জানে না
পালক পিতাটি সেই সঙ্গে সঙ্গে যাবে
যারা অগ্নিমান্দ্যে ভোগে তারা ঐ লোকটির
রক্ত মাংস খাবে।

আচার্য শঙ্কর, আমি করজোড়ে অনুরোধ করি
অকস্মাৎ এই দৃশ্যে আপনি এসে যেন না বলেন
এ তো সবই মায়া !

একটি কথা

একটি কথা বাকি রইলো থেকেই যাবে
মন ভোলালো ছদ্মবেশী মায়া
আর একটু দূর গেলেই ছিল স্বর্গ নদী
দূরের মধ্যে দূরত্ব বোধ কে সরাবে।

ফিরে আসার আগেই পেল খুব পিপাসা
বালির নিচে বালিই ছিল, আর কিছু না
রৌদ্র যেন হিংসা, খায় সমস্তটা ছায়া
রাত্রি যেমন কাঁটা, জানে শব্দভেদী ভাষা।

বালির নিচে বালিই ছিল, আর কিছু না
একটি কথা বাকি রইল, থেকেই যাবে।

নিজের আড়ালে

সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে
মানুষ দেখে না
সে খোঁজে ভ্রমর কিংবা
দিগন্তের মেঘের সংসার

আবার বিরক্ত হয়
কতকাল দেখে না আকাশ
কতকাল নদী বা ঝর্নায় আর
দেখে না নিজের মুখ
আবর্জনা, আসবাবে বন্দী হয়ে যায়
সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে

রমণীর কাছে গিয়ে
বারবার হয়েছে কাঙাল
যেমন বাতাসে থাকে সুগন্ধের ঋণ
বহু বছরের স্মৃতি আবার কখন মুছে যায়
অসম্ভব অভিমানে খুন করে পরমা নারীকে
অথবা সে অস্ত্র তোলে নিজেরই বুকের দিকে
ঠিক যেন জন্মান্ধ তখন
সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে ।

নারী

নাস্তিকেরা তোমায় মানে না, নারী
দীর্ঘ ঈ-কারের মতো তুমি চুল মেলে
বিপ্লবের শত্রু হয়ে আছো !
এমনকি অদৃশ্য তুমি বহু চোখে
কত লোকে নামই শোনেনি
যেমন জলের মধ্যে মিশে থাকে
জল-রং আলো…

তারা চেনে প্রেমিকা বা সহোদরা
জননী বা জায়া
দুধের দোকানে মেয়ে, কিংবা যারা
নাচে গায়
রান্না ঘরে ঘামে
শিশু কোলে চৌরাস্তায় বাড়ায় কঙ্কাল হাত
ফ্রক কিংবা শাড়ি পরে দুঃখের ইস্কুলে যায়

মিস্তিরির পাশে থেকে সিমেন্টে মেশায় কান্না
কৌটো হাতে পরমার্থ চাঁদা তোলে
কৃষকের পান্তা ভাত পৌঁছে দেয় সূর্য ক্রুদ্ধ হলে
শিয়রের কাছে রেখে উপন্যাস
দুপুরে ঘুমোয়
এরা সব ঠিকঠাক আছে
এদের সবাই চেনে শয়নে, শরীরে
দুঃখ বা সুখের দিনে
অচির সঙ্গিনী !

কিন্তু নারী ? সে কোথায় ?
চল্লিশ শতাব্দী ধরে অবক্ষয়ী কবি দল
যাকে নিয়ে এমন মেতেছে ?
সে কোথায় ? সে কোথায় ?
দীর্ঘ ঈ-কারের মতো চুল মেলে
সে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ?

এই ভিড়ে কেমন গোপন থাকো তুমি
যেমন জলের মধ্যে মিশে থাকে
জল-রং আলো…

আছে ও নেই

হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে সেই পাগলটি
পৃথিবীর সমস্ত পাগলের রাজা হয়ে
সে উলঙ্গ, কেননা উন্মাদ উলঙ্গ হতে পারে, তাতে
প্রকৃতির তালভঙ্গ হয় না কখনো
পাশেই গম্ভীর ট্রেন, ব্যস্ত মানুষের হুড়োহুড়ি
সকলেই কোথাও না কোথাও পৌঁছোতে চায়
তার মধ্যে এই মূর্তিমান ব্যতিক্রম, ইদানীং
অযাত্রী, উদাসীন—
মাঝারি বয়েস, লম্বা, জটপাকানো মাথা
তার নাম নেই, কে জানে আমিত্ব আছে কিনা

অথচ শরীর আছে
সুতোহীন দেহখানি দেহ সচেতন করে দেয়
পেটা বুক, খাঁজ কাটা কোমর, আজানুলম্বিত বাহু
এবং দীর্ঘ পুরুষাঙ্গ
চুলের জঙ্গলে ঘেরা
পুরুষশ্রেষ্ঠের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিড়ে, যেন সদর্পে
সন্ন্যাসী হলেও কোনো মানে থাকতো, কেউ হয়তো
প্রণাম জানাতো
কিন্তু এই শারীরিক প্রদর্শনী এত অপ্রাসঙ্গিক
টিকিটবাবুও তাকে বাধা দেয় না
রেলরক্ষীরা মুখ ফিরিয়ে থাকে
ফিল্‌মের পোস্টারের নারী পুরুষদের সরে যাবার উপায় নেই
অপর নারী পুরুষরা তাকে দেখেও দেখে না
তারা পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটু নিমেষহারা হয়েই
আবার দূরে চলে যায়
শুধু মায়ের হাত ধরা শিশুর চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে
একটি আপেল গড়িয়ে যায় লাইনের দিকে—
ঠিক সেই সময় বস্তাবন্দী চিঠির স্তূপের পাশ দিয়ে
এসে দাঁড়ায় দুটি হিজড়ে
নারীর বেশে ওরা নারী নয়, এবং সবাই জানে
ওদের বিস্ময়বোধ থাকে না
তবু হঠাৎ ওরা থমকে দাঁড়ায় ; পরস্পরের দিকে
তাকায় অদ্ভুত বিহ্বল চোখে
যেন ওদের পা মাটিতে গেঁথে গেল
সার্চ লাইটের মতন চোখ ফেরালো পাগলটির শরীরে
সেই অপ্রয়োজনীয় সুঠাম সুন্দর শরীর,
নির্বিকার পুরুষাঙ্গ
যেন ওদের শপাং শপাং করে চাবুক মারে
সূর্য থেকে গল গল করে ঝরে পড়ে কালি
এই আছে ও নেই'র যুক্তিহীন বৈষম্যে প্রকৃতি
দুর্দান্ত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে
সেই দুই হিজড়ে অসম্ভব তীব্র চিৎকার করে ওঠে—
ধর্মীয় সংগীতের মতন
ওরা কাঁদে,

দু'হাতে মুখ ঢাকে,
বসে পড়ে মাটিতে
এবং টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে মিশে যায়
নশ্বর ধুলোয়
অল্প দূরে, সিগারেট হাতে আমি এই দৃশ্য দেখি।

কথা ছিল

সামনে দিগন্ত কিংবা অনন্ত থাকার কথা ছিল
অথচ কিছুটা গিয়ে
দেখি কানাগলি
ঘরের ভিতরে কিছু গোপন এবং প্রিয়
স্মৃতিচিহ্ন থেকে যাওয়া
উচিত ছিল না ?
নেই, এই দুঃখ আমি কার কাছে বলি !

সমস্ত নারীর মধ্যে একজনই নারীকে খুঁজেছি
এই রকমই কথা ছিল
স্নিগ্ধ ঊষাকালে
প্রবল স্রোতের মতো প্রতিদিন ছুটে চলে যায়
জন্ম থেকে বারবার খসে পড়ে আলো
রাত্রির জানলার পাশে আবার কখনো হয়তো
ফিরে আসে
ফুটে ওঠে ছোট্ট কুন্দ কলি।
তবু ঘোর ভেঙে যায় কোনো কোনো দিন
চেয়ে দেখি, সত্য নয়
শুধুই তুলনা !
নেই, এই দুঃখ আমি কার কাছে বলি !

আমি নয়

পথে পড়ে আছে এত কৃষ্ণচূড়া ফুল
দু' পায়ে মাড়িয়ে যাই, এলোমেলো হাওয়া
বড় প্রীতি স্পর্শ দেয়, যেন নারী, সামনে বকুল
যার ঘ্রাণে মনে পড়ে করতল, চোখের মাধুরী
তারপরই হাসি পায়, মনে হয় আমি নয়, এই ভোরে
এত সুন্দরের কেন্দ্র চিরে
গল্পের বর্ণনা হয়ে হেঁটে যায় যে মানুষ
সে কি আমি ?
ক্ষ্যাপাটের মতো আমি মুখ মুচকে হাসি।

★

ক্যাবিনের পর্দা উড়লে দেখা যায় উরুর কিঞ্চিৎ
একটি বাহুর ডৌল, টেবিলে রয়েছে ঝুঁকে মুখ
ও পাশে কে ? ইতিহাস চূর্ণ করা নারীর সম্মুখে
রুক্ষচুল পুরুষটি এমন নির্বাক কেন ? শুধু সিগারেট
নড়েচড়ে, এর নাম অভিমান ? পাঁচটি চম্পক
এত কাছে, তবু ও নেয় না কেন, কেন ওর ওষ্ঠে
দেয় না গরম আদর ?
শুধু চোখে চোখ—একি অলৌকিক সেতু, একি
অসম্ভব চিন্ময়তা
চায়ের দোকানে ঐ পুরুষ ও নারী মূর্তি ব্যথা দেয়,
বুকে বড় ব্যথা দেয়
ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয় ইদানীং বেড়াতে এসেছে।

★

মধ্যরাত্রি ভেঙে ভেঙে কে কোথায় চলে যায়, যেন উপবনে
বসন্ত উৎসব হলো শেষ
বিদায় শব্দটি যাকে বিহ্বল করেছে
অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে সে এখন দ্রুত উঠে আসে
চাঁদের শরীর ছুঁতে
অথবা স্বর্গের পথ এই দিকে হঠাৎ ভেবেছে
দরজা খুলো না তুমি, দূর থেকে রুক্ষ বাক্য বলে দাও
ও এখন দুঃখে নোংরা, দু' হাতে তীব্রতা
এবং কপালে তৃষ্ণা, পদাহীন জানালার দিকে

দুই চোখ
মাতালের অস্থিরতা মাধুর্যকে ওষ্ঠে নিতে চায়—
অথচ জানে না
গোধূলির কাছে তার নির্বাসন হয়ে গেছে কবে !
দরজা খুলো না তুমি, দূর থেকে রুক্ষ বাক্য বলে দাও
ও তোমার জানু আঁকড়ে আহত পশুর মতো ছট্‌ফটাবে
অতৃপ্তির সহোদর, সশরীর নিষিদ্ধ আগুন
ক্ষমা করো, আমি নই, ক্ষমা করো, দুঃস্বপ্ন, বিষাদ···

মায়া

মারা যেন সশরীর, চুপে চুপে মশারির প্রান্তে এসে
জ্বালছে দেশলাই
ভেতরে ঘুমন্ত আমি—
বাতাস ও নিস্তব্ধতা এখন দর্শক
রাত্রি এত স্নিগ্ধ, এত পরিপূর্ণ, যেন নদী নয় ।
স্বপ্ন নয়
স্বয়ং মায়ার হাত আমাকে আদর করে
ঘুম পাড়ালো
আসবার কৌতুকে মেতে মশারিতে জ্বালাবে আগুন
সমস্ত জানালা বন্ধ, দরোজায় চাবি
আহা কি মধুর খেলা, সশস্ত্র সুন্দর
আমাকে জাগাও তুমি,
আমাকে দেখতে দিও শুধু ।

অন্যরকম

পাহাড় শিখর ছেড়ে মেঘ ঝুঁকে আছে খুব কাছে
চরাচর বৃষ্টিতে শান্ত
আমি গম্ভীর উদাসীন ব্রহ্মপুত্রের পাশে চুপ করে দাঁড়াই
জলের ওপারে সব জল-রং ছবি
নারীর আচমকা আদরের মতন স্নিগ্ধ বাতাস—

এই চোখজুড়োনো সকাল, অদ্ভুত নিথর দিগন্ত
মনে হয় অজানা সৌভাগ্যের মতন
তবু সুন্দরের এত সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ
আমার মন খারাপ হয়ে যায়
মনে হয়, এ জীবন অন্যরকম হবার কথা ছিল ।

স্মৃতি

বাল্যকালে একটা ছিল বিষম সুখ
তখন কোনো বাল্যকালের স্মৃতি ছিল না
স্মৃতি আমায় কাঁটার মতন বেঁধে
আমায় নির্জনতায়
চক্ষু বেঁধে ঘোরায়
স্মৃতি আমায় শাসন করে
ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন ভাঙায়
আমার কিছু ভালো লাগে না
জন্ম গেল আকণ্ঠ এক
তৃষ্ণা নিয়ে
জন্ম থেকেই কেউ এলো না
বাল্যকালে একটা ছিল বিষম সুখ
তখন কোনো বাল্যকালের স্মৃতি ছিল না…

পৃথিবী ও আমি

আমি মরে যাবো, তাই পৃথিবী দুঃখিনী
হয়ে আছে
আকাশ মেঘলা, নেই হাওয়া কিংবা
বৃক্ষের শিখরে শিহরন
কেন যাবে, কেন চলে যাবে এই বৃষ্টির বিকেল
ছেড়ে
শূন্য অজানায়
কেউ এই কথা বলে কানে কানে চুপে ।

আমি হাসি, দিই না উত্তর
পৃথিবীর সঙ্গে খুব ভালোবাসা ছিল, আর
দু'জনে নিভৃতে কতদিন
মুখোমুখি বসে থেকে,
চোখে রেখে চোখ
দেখেছি সময় আর ইতিহাস, পিঁপড়ের সারি
দেখেছি জয়ের কণ্ঠে বাসি ফুলমালা
আমার প্রেমিকা এই পৃথিবীকে
অত্যন্ত আদরে
এবং স্নেহের সঙ্গে লালন করেছি।
ইদানীং ভয় হয়, পৃথিবীর মুখ দেখে মনে হয়
যেন তার মন ভালো নেই
যেন কোনো গোপন অসুখ তাকে কুরে কুরে খায়
যদি তার মৃত্যু হয় ! ভয় হয় !
তার চেয়ে আগে আগে
আমারই তো চলে যাওয়া ভালো !

অনেক দূরে

পরিত্যক্ত মন্দিরের ভাঙা সিঁড়িতে বসে
দু'এক মুহূর্ত বিশ্রাম
মন্দির কখনো গৃহ হয় না
আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে।
গন্ধলেবুর ঝোপে ডেকে ওঠে
তক্ষক সাপ
এ কিসের সঙ্কেত ?
যে-আকাশ আশ্চর্য সুন্দর নীল ছিল
এখন সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে শকুন
বাতাস হঠাৎ পাগল হয়ে দাপাদাপি করে—
এ কিসের সঙ্কেত ?
আমাকে অনেক দূরে
আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে।

চায়ের দোকানে

লণ্ডনে আছে লাস্ট বেঞ্চির ভীরু পরিমল,
রথীন এখন সাহিত্যে এক পরমহংস
দীপু তো শুনেছি খুলেছে বিরাট কাগজের কল
এবং পাঁচটা চায়ের বাগানে দশআনি অংশ
তদুপরি অবসর পেলে হয় স্বদেশসেবক ;
আড়াই ডজন আরশোলা ছেড়ে ক্লাস ভেঙেছিল
পাগলা অমল
সে আজ হয়েছে মস্ত অধ্যাপক !
কি ভয়ংকর উজ্জ্বল ছিল সত্যশরণ
সে কেন নিজের কণ্ঠ কাটলো ঝক্‌ঝকে ক্ষুরে—
এখনো ছবিটি চোখে ভাসলেই জাগে শিহরন
দূরে চলে যাবে জানতাম, তবু এতখানি দূরে ?

গলির চায়ের দোকানে এখন আর কেউ নেই
একদা এখানে সকলে আমরা স্বপ্নে জেগেছিলাম
এক বালিকার প্রণয়ে ডুবেছি এক সাথে মিলে পঞ্চজনেই
আজ এমনকি মনে নেই সেই মেয়েটিরও নাম ।

নিশির ডাক

ছিলাম ঘুমন্ত, কে যেন আমায় নাম ধরে স্পষ্ট ভাবে ডাকলো
তিনবার, শিয়রের খুব কাছ থেকে
ব্যগ্র, চেনা কণ্ঠস্বর—
ধড়মড় করে উঠে বসি, আমি-সমেত শূন্য অন্ধকার ঘর
খোলা জানলার পাশে নিমগাছ
তার পাশে হিম আকাশ !
দরজা খুলে বারান্দাতেও উঁকি মেরে দেখলাম
কোথাও কেউ নেই, বাতাস ও জ্যোৎস্নার মেশামেশি
পৃথিবী ও পৃথিবী ছাড়িয়ে অশরীরী স্তব্ধতা—
অথচ স্পষ্ট ডাক শুনেছিলাম, চেনা গলা অথচ নাম জানি না !
ফের বিছানায় শুয়েও খট্‌কা যায় না

তবে কি আমারই আত্মা ডেকে উঠেছিল আমাকে
ঘুমের মধ্যে ?
অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে কোনো একটা জরুরি কথা বলতে চেয়েছিল ?
কি ?
শুধু ঘুমের মধ্যেই সে কথা বলা যায় ?
জেগে উঠে ভুল করেছি ?

সব সময় মনে হয়, আমার একটা ক্ষমা চাইবার আছে
কিন্তু অপরাধটা ঠিক চিনতে পারি না।
সব সময় মনে হয়, আমি একটা বিশেষ জরুরি কাজের কথা ভুলে গেছি
অথচ মনে পড়ে না
প্রেমের মধ্যে কোনো ছলনা, অগোচরে কোনো পাপ
বুঝি ঘটে যাচ্ছে যে-কোনো সময়
ঘুমের মধ্যে আমার বিস্মৃতির ওপার থেকে ভেসে আসছিল
সেই কণ্ঠস্বর !
কেন জেগে উঠলাম ?

জন্মান্ধের গান

'যতদিন বাঁচবো যেন দু'চোখ খুলেই বেঁচে থাকি'
একজন অন্ধ ভিখারী গান গাইছে রাসের মেলায়,
তিনজন শহুরে বাবু তুড়ি দিচ্ছে, এবং পোশাকি
হাসি হেসে পয়সা ছুঁড়ছে এলোমেলো, নিতান্ত হেলায়।
তারা কিন্তু অন্ধ নয়, চোরা চোখে দেখছে চারদিকে
নধর ডাঁটার মতো ছুঁড়িটি বেশ, সঙ্গে আছে নাকি
অন্য কেউ ? কি সুন্দর পুতুলটা দেখ্ মাত্র পাঁচ সিকে ;
সাঁওতালীরা আয়না কিনছে, সন্ধে নামল, এখনো অনেক রঙ্গ বাকি।

অন্ধ ভিখারীটি ফিরলো গান সেরে, হাটখোলার পাশে তার কুঁড়ে
'যতদিন বাঁচবো যেন দু'চোখ খুলেই বেঁচে থাকি'
শুদ্ধ, পরিশ্রুত এক মিশমিশে আলো তার দুই চক্ষু জুড়ে
উদ্ভাসিত করে দৃশ্যে, প্রান্তর,আকাশ, রাত্রি, আঁধার, জোনাকি ;
অথবা করে না হয়তো, জন্মান্ধ নির্বোধ লোকটা শোনা গান গায় শেখা সুরে
সেইদিন অর্থ বুঝবে, যেদিন কবরে শোবে তিন ফুট কালো মাটি খুঁড়ে।

দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি

দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি বারান্দায়
অহঙ্কার তোমাকে মানায় না
তুমি কি যে-কোনো নারী
যে-কোনো বারান্দা থেকে
সন্ধ্যার শিয়রে
মাথা রেখে আছো ?
তুমি তো আমারই শুধু, দূর থেকে দেখা
শুকনো চুল, ভিজে মুখ, করতলে মসৃণ চিবুক
তুমি নারী
অহঙ্কার তোমাকে মানায় না—
যে তোমাকে দেখে, সে-ই তোমাকে সুন্দর করে
দ্রষ্টা যে, ঈশ্বরও সে।
তোমার নিঃসঙ্গ রূপ মেশে বাতাসের হাহাকারে।

দুই বন্ধু

—কোন দিকে যাবো ?
—যেদিকে যখন খুশি, যাসনি দক্ষিণে
—এই মাত্র উত্তর সন্ধান করে ফিরে আসছি
—কে দেখলি ?
—একটি রমণী তার হিংস্র নখে মেরে ফেললো
একটি টিয়া পাখি,
পাখির রক্তের মধ্যে
মেশালো দু'ফোঁটা অশ্রু
তারপর হেসে উঠলো

—তারপর ?
—নির্জনে নাচের সভা শুরু হলো

—সভাসদ কারা ?
—কেউ নয় কিংবা
একলা হিজল গাছ, ঝিরঝির নদী
এরাই দেখেছে সেই রমণীর
ছন্দোময় স্তন, উরু, রেখার মহিমা

—আর তুই ?
—আর আমি ?
আদিবাসিনীর সেই অশ্রু মাখা হাসির উল্লাস
পাখিটির রক্ত
এর যেন অন্য কোনো মানে আছে ?

—হয়তো রয়েছে।
—এবার বল্‌তো কেন
নিষেধ করলি ?

—আমি যা দেখেছি তোকে চাইনি দেখাতে
এক একটা দৃশ্য থাকে
নিজের বুকের মধ্যে কারুকার্য করে রাখা
অন্যের প্রবেশ মানা
সেইটাই সবার কাছে দক্ষিণের প্রবল নিষেধ।

সিংহাসনে ঘুণ পোকা

সিংহাসনে ঘুণ পোকা শব্দ করে
কেউ তা শোনেনি
সকলেই ভেবে বসে আছে যেন
রাজ্যপাট আছে ঠিকঠাক
আকাশ রয়েছে ঠিক আকাশেরই মতো
রোদ জল ঝড় নিয়ে সময়ের এত হুড়োহুড়ি
সবই আগেকার মতো, যেমন মানুষ
অকারণে মরে যায়, আবার জন্মায়
এই যে নিশ্চিন্ত সুখ, প্রগাঢ় প্রশান্তি, এর

অলক্ষ্যে আড়ালে
সিংহাসনে ঘুণ পোকা শব্দ করে কির কির কির কির...

উপত্যকার পাশে

দুঃখ এসে আমার ধরলো উপত্যকার পাশে
এতদিন তো পালিয়ে ছিলাম
নদীর ধারে যাইনি
যাইনি বকুল গাছের নিচে
শিশির ভেজা ঘাস মাড়িয়ে
লুকোচুরির খেলায় ওকে ক'বার দিলাম ফাঁকি !
এমনকি এই ভোরের বেলায় রৌদ্র যখন কাঁপে
নারী যখন বৃষ্টি হয়ে
চক্ষু দুটি ধাঁধায়
কোমল বুকে নখের দাগে রক্তে ওঠে তুফান
আমি তখন হর্ষ এবং হর্ষ এবং হর্ষ
নিয়েই ছিলাম
দুঃখ নামে তুড়ি দিয়েছি
মৃত্যু যেমন অলীক !

ভুল করেছি, একা এসেছি, হঠাৎ অতর্কিতে
দুঃখ শেষে আমায় ধরলো
উপত্যকার পাশে ।
আমায় এবার বন্দী করে, দু'হাত বেঁধে
নেবে বিচার সভায়
হর্ষ এবং হর্ষ এবং হর্ষ আমায় কঠিন শাস্তি দেবে ?

নারী কিংবা ঘাসফুল

মনোবেদনার রং নীল না বাদামী ?
নদীর চরায় আজ ফুটে আছে ঘাসফুল
হলুদ ও সাদা

ওদেরও হৃদয় আছে ? অথবা স্বপ্নের বর্ণচ্ছটা
একদিন এই নদী প্রান্তে এসে খুশিতে উজ্জ্বল হই
আবার কখনো আমি এখানেই বিষণ্ণ, মন্থর
মুখ নিচু করে আমি প্রশ্ন করি
ঘাসফুল, তুমি কি নারীর মতো
দুঃখ দাও
আনন্দেরও তুমিই প্রতীক ?

চরিত্র বিচার

কেউ কেউ আলো চায় না, চিরদিন এই পৃথিবীকে
মাতৃগর্ভ মনে করে বেঁচে থাকে কলুষ আঁধারে
কেউ প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কয়েকটি সনেট যায় লিখে
কেউ বা কুক্কুর-সম প্রভুর পত্নীর স্নেহ কাড়ে।

অনেক মানুষ শুধু সরল রেখার মতো বোবা
একটিও ইন্দ্রিয় নেই, ষড়রিপু ছোঁয়নি ঘৃণায়
হঠাৎ দেখলে ঠিক মনে হয় পুরুষ-বিধবা ;
বহুকাল বেঁচে থেকে একদিন শেষে নিভে যায়
নির্মম হাওয়ার তোড়ে, কিছুদিন ফটো হয়ে বাঁচে
এবং বীজের মতো উত্তরাধিকার, সন্তানের
রক্তকে দূষিত করে, ক্লীব করে, ডাস্টবিনে আনাচে কানাচে
ধুলো হয়ে ওড়ে শেষে। রক্তের বণিকও আছে ঢের
আমাদের আশেপাশে, প্রেম নেই প্রেমের বিচার নেই
কোনো
শুধু রক্ত বিক্রি করে, খ্যাতি, লোভ ইত্যাকার
বালক ক্রীড়ায়
দাম পায় কানাকড়ি অবশ্যই ; আরো আছে, শোনো
কেউ মরে সুস্থ দেহে, কেউ বাঁচে দীর্ঘদিন কুৎসিত পীড়ায়।
আমাকে এদের মধ্যে কোন দলে ফেলবে তুমি জানো—
যা তোমার খুশি !

এখন একবার

সবচেয়ে কী বেশি ভেঙে চুরে, গুঁড়িয়ে
ছন্নছাড়া হয়ে যায় ?
স্বপ্ন !
মেঘলা দুপুরবেলা পথে পথে ছড়ানো
দেখতে পাই
ওদেরই ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ।
গাড়ির চাকায় ছেটকানো নোংরা জলের
মতন এক একটা উপলব্ধি
চমকে দেয়
কোনো রাস্তাই কোথাও যায় না, যে যেখানে—
নিসর্গের ফুঁয়ের মতন পাতলা কুয়াশা
বিছিয়ে থাকে নদীর প্রান্তে
যে-নদী বহুদিন দেখিনি, যে-নারীদের
তারাও রূপ ও লাবণ্যের
পাশাখেলায় হেরে গিয়ে
সময়ের ফাঁদে প্রশ্নচিহ্ন হয়ে আছে।
কালপুরুষের থুতনি নেড়ে দিয়ে এখন
একবার ইচ্ছে হয়
হুর-রে বলে চেঁচিয়ে উঠতে।

একবারই জীবনে

দুই হাতে মৃত্যু নিয়ে ছেলেখেলা করার বিলাস
প্রথম যৌবনে ছিল।
ভাবতাম,
নদীর আকাশে লঘু মাছরাঙা পাখির মতন
মৃত্যুর দু'ধারে ঘেঁষে ছুটোছুটি
জীবনকে রূপরস দেয়।
বারবার
আমি কি যাইনি সেই মৃত্যুমুখী দক্ষিণের ঘরে ?
বাঁধের কিনার থেকে গড়ানো বন্ধুর হাত ধরে থাকা

আন্তরিক মুঠি
যমদণ্ড দেখেছিল।
যৌবনে এসবই খেলা।
যখন মানুষ মরে, একবারই জীবনে মরে,
তারপর আর কোনো খেলা নেই।
আর কোনো অস্পষ্টতা, নদীর কিনারে বসে থাকা নেই।
হঠাৎ বিমান থেকে বাচাল মেশিনগান ফুঁড়ে যায় দেহ
এখন যা শকুন ও কুকুরের ভোগ্য
আর কোনো খেলা নেই।

অতৃপ্তি

বৃষ্টির দিনে আরাম চেয়ারে জানলার পাশে বসবো ভেবেছি
তাও তো পারি না
একজন কেউ বৃষ্টি ভিজতে আমার চোখের সম্মুখ দিয়ে হেঁটে চলে যাবে
কে ? নাম জানি না !
সকালবেলায় দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ের কাপেও তৃপ্তি হয় না
হৃদয় ভরে না
একজন কেউ সেই মুহূর্তে বন্যায় ডোবে, অথবা তৃষ্ণা বুকে নিয়ে মরে
বাসনা মরে না—
পাহাড় চূড়ায় বেড়াতে যাবার কতদিন ধরে প্রবল ইচ্ছে
চিঠি লেখালেখি
তখনই অন্য পাহাড়ে কে যেন মেশিনগানের সামনে লুটিয়ে পড়লো হঠাৎ
তার মুখ দেখি।

তোমাকে ছাড়িয়ে

জাদুদণ্ড তুলে বললে, এখন বিদায় !
জানালা ঘুরে হাওয়া এলো আলমারির কোণে
ঝোলানো কিরীচ থেকে ঝলসে উঠলো প্রতিহিংসা
শ্রাবণের অপরাহ্ণে মহিষের ঘণ্টাধ্বনি মনকে ফেরায়।

আমার চোখের নিচে কালো দাগ, এসে দেখো, কিংবা থাক্ এখন এসো না
ব্যান্ডেজের মধ্যে একটা পোকা ঢুকলে যত অসহায়
তার চেয়ে কিছু কম, চিঠি হারানোর চেয়ে বেশি
বাদামি দুঃখের ছায়া তোমাকে ছাড়িয়ে ভেসে যায়।

নারী ও শিল্প

ঘুমন্ত নারীকে জাগাবার আগে আমি তাকে দেখি
উদাসীন গ্রীবার ভঙ্গি, শ্লোকের মতন ভুরু
ঠোঁটে স্বপ্ন কিংবা অসমাপ্ত কথা
এ যেন এক নারীর মধ্যে বহু নারী, কিংবা
দর্পণের ঘরে বাস
চিবুকের ওপরে এসে পড়েছে চুলের কালো ফিতে
সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না, কেননা আবহমান কাল
থেকে বেণীবন্ধনের বহু উপমা রয়েছে
আঁচল ঈষৎ সরে গেছে বুক থেকে—এর নাম বিস্রস্ত,
এরকম হয়
নীল জামা, সাদা ব্রা, স্তনের গোলাপী আভাস, এক
বিন্দু ঘাম
পেটের মসৃণ ত্বক, ক্ষীণ চাঁদ নাভি, সায়ার দড়ির গিঁট
ঊরুতে শাড়ীর ভাঁজ, রেখার বিচিত্র কোলাহল
পদতল—আল্পনার লক্ষ্মীর ছাপের মতো
এই নারী

নারী ও ঘুমন্ত নারী এক নয়
এই নির্বাক চিত্রটি হতে পারে শিল্প, যদি আমি
ব্যবধান ঠিক রেখে দৃষ্টিকে সন্ন্যাসী করি
হাতে তুলে খুঁজে আনি মন্ত্রের অক্ষর
তখন নারীকে দেখা নয়, নিজেকে দেখাই
বড় হয়ে ওঠে বলে
নিছক ভদ্রতাবশে নিভিয়ে দিই আলো
তারপর শুরু হয় শিল্পকে ভাঙার এক বিপুল উৎসব
আমি তার ওষ্ঠ ও ঊরুতে মুখ গুঁজে

জানাই সেই খবর
কালস্রোত সাঁতরে যা কোথাও যায় না !

প্রেমিকা

কবিতা আমার ওষ্ঠ কামড়ে আদর করে
ঘুম থেকে তুলে ডেকে নিয়ে যায়
ছাদের ঘরে
কবিতা আমার জামার বোতাম ছিঁড়েছে অনেক
হঠাৎ জুতোয় পেরেক তোলে !
কবিতাকে আমি ভুলে থাকি যদি
অমনি সে রেগে হঠাৎ আমায়
ডবল ডেকার বাসের সামনে ঠেলে ফেলে দেয়
আমার অসুখে শিয়রের কাছে জেগে বসে থাকে
আমার সুখকে কেড়ে নেওয়া তার প্রিয় খুনসুটি
আমি তাকে যদি
আয়নার মতো
ভেঙে দিতে যাই
সে দেখায় তার নগ্ন শরীর
সে শরীর ছুঁয়ে শান্তি হয় না, বুক জ্বলে যায়
বুক জ্বলে যায়, বুকে জ্বলে যায়…

সময় খোলেনি

দরজা খুলেছো, তুমি, সময় খোলেনি
চোখ থেকে খসে গেল শেষ অহঙ্কার
কেন বুক কাঁপে, কেন চক্ষু জ্বালা করে
তারও ইতিহাস আছে, যেমন যৌবন
কাঁটা বনে খুঁজে এলো বিখ্যাত অমিয়
দরজা খুলেছো তুমি—সময় খোলেনি ।

আরও কাছাকাছি এলে বুকে লাগে বুক

তোমার উরুর কাছে আমার পৌরুষ
সম্রাটত্ব শেষ করে ভিখারি সেজেছে
এর পরও কথা থাকে, শূন্য প্রতিধ্বনি
যেমন মৃত্যুকে বলে, তিলেক দাঁড়াও !
দরজা খুলেছো তুমি, সময় খোলেনি ।

স্বর্গের কাছে

কত দূরে বেড়াতে গেলুম, আর একটু দূরেই ছিল স্বর্গ
দু' মিনিটের জন্য দেখা হলো না
হঠাৎ ট্রেন হুইশ্‌ল দেয়
খুচরো পয়সার জন্য ছোটাছুটি
রিটার্ন টিকিটে একটি সই
আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি !
এত কাছে, হাতছানি দেয় স্বর্গের মিনার,
ঘ্রাণ আসে পারিজাতের
ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসবো না ?
শরীর উদ্যত হয়েছিল, সেই মুহূর্তে চলন্ত ট্রেন
আমায় লুফে নেয়
পাপের সঙ্গীরা হা-হা-হা-হা করে হাসে
দেখা হলো না, দেখা হলো না, আমার সর্বাঙ্গে এই শব্দ
অস্তিত্বকে অভিমানী করে
আমি স্বর্গ থেকে আবার দূরে সরে যাই !

মুক্তো

তোমার গলার মুক্তোমালা ছিঁড়ে পড়লো হঠাৎ
এখন আমি খুঁজে চলেছি
একটা একটা মুক্তো যাদের
হারিয়ে যাবার প্রবণতা !
এখানে আলো, ঐ আঁধার
কাঁটার ঝোপ, বহু বাধার

আড়ালে খোঁজে চোখ, যেমন হিংস্রতাকে
খুঁজে ছিলেন এক সন্ত
মাঝে মাঝেই কাচের টুকরো চোখ ধাঁধায়
ওরে ডাহুক, জগৎ এখন তৃপ্ত, তোর
ডাক থামা !

ঘাসের ডগায় বিখ্যাত সেই শিশিরবিন্দু
এই সময় ?
ওরা তো কেউ মুক্তো নয়, মুক্তো নয়
উপমা যেমন যুক্তি নয়
তারার অশ্রুপাতের কথাও মনে পড়ে না !
আমি নারীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি
চূর্ণ অলক
দুই অপলক চোখের মধ্যে ঐতিহাসিক নীরবতা
আমি খুঁজছি
বুকের কাছে শূন্যতার সামনে হাত কৃতাঞ্জলি
খুঁজে চলেছি, খুঁজে চলেছি...

চাবি

বহু রকমের চাবি-বন্দী হয়ে আছে এই ঘর
দেরাজ, আলমারি, বাক্স, বস্তুর সমস্ত স্পর্ধা
দমন করেছে এই
একটি মাত্র পিতলের কাঠি
মাঝে মাঝে ভাবি আমি, চাবিরও কি প্রাণ আছে নাকি ?
বড় তেজী, অভিমানী, ওরা জানে
জীবনের মর্ম ঠিক কিসে
তাই তো অজ্ঞাতবাসে চলে যায় প্রায়শই
অন্ধকারে চুপি চুপি হাসে
যেমন এক একটা চিঠি সভ্যতার মর্মমূলে
বদলে দিতে পারে সব
স্বপ্নের স্থাপত্য !
পরবর্তী আলোড়ন, হুলুস্থুলু—আসলে যা ইন্দ্রিয়ের

ভাত-ঘুম ভাঙা !

মধ্যরাত্রে যেন কেউ বাইরে ডাকে, ভয় হয়,
তবু যেতে হয়
অন্ধকারে পৃথিবী বিশাল হয়ে চুপে শুয়ে আছে
সেখানে দাঁড়িয়ে এক
হাতে-পায়ে শৃঙ্খলিত বিষণ্ণ মানুষ
হারিয়ে ফেলেছে সব চাবি
হারিয়ে ফেলেছে সব দাবি
মুখের আদল দেখে চেনা যায়, তবু
মনে হয়, না-চেনাই ভালো !

শরীর

এমন রোদে বেড়িয়ে এলো শরীর
শরীর, তোমার কষ্ট হলো নাকি ?
দুঃখ ছিল একটা কানাকড়ির
তাও হারাবার একটুখানি বাকি !

শরীর, তুমি ওষ্ঠ ছুঁয়ে ছিলে
স্বর্গ থেকে এলো বেভুল হাওয়া
চক্ষু এবং নাভির স্পর্শে মিলে
যা পেলে তার নাম কি ছিল পাওয়া ?

মেঘলা দিনে কুমারী-মুখ ছায়া
হিজল বনে ভয়-হারানো পাখি
জানলা খোলে মূর্তিমতী মায়া
শরীর, তোমার ঈর্ষা হলো নাকি ?

শুয়ে আছি

যেন অতিকায় এক সিংহের মতন রূপ,
তার পদতলে
কতদিন কতকাল আমি শুয়ে আছি
জ্বলে চোখ, জ্বলে স্নায়ু, ছেঁড়ে মাংস, পাশে এক নদী
তার জল ছলচ্ছলে
শোনা যায় নীল গান, কপিশ রঙের স্মৃতি—
এই ভাবে যতকাল বাঁচি।
কিংবা যেন নারী, তার বিপুল শ্রেণীর ভার, স্তনের উদ্যত গর্ব
মুক্ত মেখলায়
হঠাৎ সম্মুখে ঝুঁকে স্থিরচিত্র,
এই মূর্তিখানি বহুকাল
আমাকে পায়ের নিচে রেখে হাসে, দিগন্ত দোলায়
খড়্গের মতন উরু, নাকি মাটি ? শুধুই মাটির ছাঁচ !
পলকে বিভ্রম হয়, চাঁদ কিংবা নাভি
ওপরে তাকাই, কোনো বাণী নেই, আকাশের শান্ত সাদা দাবি।

সব গ্রন্থ শেষ হলে, পুরোনো গ্রন্থের মতো নিসর্গের স্বাদ
জিভ দিয়ে ছোঁয়া যায়, স্পর্শ করে বোঝা যায় এমন বাতাস
মানুষের দিকে ফিরলে চোখে পড়ে মানুষেরই
ধ্রুব পরমাদ
আমিও মানুষ নয় ? আয়নার ওপরে আছে আমার নিশ্বাস
আমিও জলের পাশে সিংহ কিংবা রমণীর
পায়ের তলায় শুয়ে আছি
শোনা যায় নীল গান, কপিশ রঙের স্মৃতি এই নিয়ে
যতকাল বাঁচি।

মহতের কাছে

সূর্যকে প্রণাম করছে পর্বত, এ দৃশ্য আমি অন্তত একবার
এ জীবনে দেখে যাবো—লজ্জিত, আভূমিনত বৃহতের কাছে
অন্য এক বৃহত্তর,—দীপ্ত মূর্তি, আশীর্বাদ ভঙ্গিতে উদার

দেখে যেতে সাধ হয় ; মনে হয় হয়তো আজও আছে
কোথাও বৃহৎ স্পর্ধা, অতিকায় মহত্ত্ব নিশান—
এই ক্ষুদ্র, নীতিহীন, সরু-চোখ, কালো-ঠোঁট, মানুষের ভিড়ে,
গণ্ডুষ জলের মধ্যে প্রেম-খ্যাতি লোভে মত্ত সফরীর প্রাণ
আকাশের হাওয়া টেনে ঋণী হয়, ঋণ শোধ করে না শরীরে।

সূর্যকে প্রণাম করছে পর্বত, এ দৃশ্য আমি অন্তত একবার
এ জীবনে দেখে যাব,
পুরাণের পৃষ্ঠা ছেড়ে
দৃশ্যমান স্থাবরে জঙ্গমে
যেতে হবে বহু দূর, ভেঙে দিয়ে এই বদ্ধ দ্বার
রথের মেলায় কিংবা শস্য ক্ষেতে, যেতে হবে
সুতোকলে, গ্রন্থাগারে,
ত্রিবেণী সঙ্গমে
যে-কোনো গর্বের কাছে, যে-কোনো স্পর্ধার কাছে
দেখে নিতে হবে তার কতটা মহিমা
সামান্য, ক্ষুদ্রের বাসা, এ জীবনে যেন একবার ভাঙে
তারই নিজে হাতে গড়া যতখানি সীমা।

দেখি মৃত্যু

আমি তো মৃত্যুর কাছে যাইনি, একবারও,
তবুও সে কেন ছদ্মবেশে
মাঝে মাঝে দেখা দেয়!
এ কি নিমন্ত্রণ, এ কি সামাজিক লঘু যাওয়া আসা ?
হঠাৎ হঠাৎ তার চিঠি পাই, অহংকার
নম্র হয়ে ওঠে
যেমন নদীর পাশে দেখি এক নারী
তার চুল মেলে আছে
চেনা যায় শরীরী সংকেত
অমনি বাতাসে ওড়ে নশ্বরতা
ভয় হয়, বুক কাঁপে, সবকিছু ছেড়ে যেতে হবে ?
যখনই সুন্দর কিছু দেখি

যেমন ভোরের বৃষ্টি
অথবা অলিন্দে লঘু পাপ
অথবা স্নেহের মতো শব্দহীন ফুল ফুটে থাকে
দেখি মৃত্যু, দেখি সেই চিঠির লেখক
অহংকার নম্র হয়ে আসে
ভয় হয়, বুক কাঁপে, সবকিছু ছেড়ে যেতে হবে ?

নাম নেই

'অরুণোদয়ে'র মতো শব্দ আমি বহুদিন
লিখিনি, হয়তো আর
কখনো লিখবো না
এমন সময় মেঘ গুরু গুরু শব্দ করে—
এ কি সুদূর-গর্জন নাকি মেঘমন্দ্র ?
শব্দের অমেয় নেশা যতখানি অস্থিরতা দিয়েছিল
ততখানি নারীও জানে না
শিহরন শব্দটিতে যে রকম বারবার শিহরন হয়
ভুলে যাওয়া বাল্যস্মৃতি থেকে ফের
উঠে আসে 'প্রহেলিকা'
বিকেলের চৌরাস্তায় অকস্মাৎ সব পথ
এলোমেলো হয়ে যায়
কবিতা লেখার কিংবা না-লেখার দুঃখ এসে
বুক চেপে ধরে
দুঃখ, না দুঃখের মতো অন্য কিছু
যার নাম নেই ?

ভুল সময়ে

আমি ভুল সময়ে জন্মেছি তাই আমায় কেউ চিনতে পারে না
আমার টেবিল চেয়ারে বসে থাকার কথা ছিল না
আমার জন্মের আগেই পৃথিবীর জঙ্গলগুলো
অভয়ারণ্য হয়ে গেল

সমুদ্র থেকে উপে গেল জলদস্যুরা
পথে জ্বললো আলো, বেজে উঠলো ছুটির নির্দিষ্ট ঘণ্টা।

মাঝে মাঝেই শূন্য হাতে অনুভব করি একটা তলোয়ার
পায়ের তলায় ঘোড়ার রেকাব
পাহাড়ী বাতাসের উল্টো দিকে ছুটে যাবার জন্য
আমার সব রোমকূপ সতর্ক হয়ে ওঠে
সামনে দেখতে পাই দুর্গের চূড়া, যেখানে আমার যাবার কথা ছিল।

আমি ভুল সময়ে জন্মেছি, তাই কিছুই চিনতে পারি না
বেলা বাড়ে, দিন যায়, তবু এ কি ঘোর একাকীত্ব
এই সব শুকনো নদী, পিচ বাঁধানো রাস্তা কিছুই
আমার ভালো লাগে না
নারীদের কাছে আমি পশুর মতন গন্ধ শুঁকি, তাদের ওষ্ঠ, বুক
ও নাভিলেহন করি, মনে হয়, এ নয়, এ নয়
আমি যাকে চেয়েছিলাম, সে রয়ে গেছে বড় উঁচুতে,
যেন অন্য এক শতাব্দীতে,
সামনে না পেছনে
দিগন্ত একাকার হয়ে যায়, হারিয়ে যায় সব কিছু!

শহরের একটি দৃশ্য

প্রেসার কুকারে সিটি বেজে উঠলো যেই
সঙ্গে সঙ্গে এলো টেলিগ্রাম
বছর দেড়েক ধরে যে ভুগছিল স্যানাটোরিয়ামে
সে আজ সকালে চলে গেছে
বাড়িতে শোকের কালো ছায়া ঠিক নেমে না এলেও
এ মুহূর্ত থেকে কালাশৌচ
প্রেসার কুকার নামলো, দমকা সুগন্ধ, তার ওপরে ছড়ালো
দীর্ঘশ্বাস

কলতলায় হারানের মা তখন বাসন মাজছিল
যার হাজা ধরা হাতে সব সময়ে জ্বালা আর জ্বালা

ভাগ্যটা খুললো তারই
সবটা মাংসই ঢেলে অ্যালুমিনিয়াম ডেকচিতে
দেওয়া হলো তাকে উপহার
তবু তার মুখটা গুমোট, যে রকম রোজই থাকে
তার কোনো মতামত নেই।
তখন হাওয়ায় উড়ছে রাধাচূড়া, জারুলের রঙিন পাপড়ি
কপিং পেন্সিলে আঁকা মেঘের গা ঘেঁষে যায়
একসার হাঁস।

ডেকচিটা হাতে নিয়ে হারানের মা রাস্তায়
বেরিয়ে এসেছে
তাকে আরও এক বাড়ির কাজ সারতে হবে
তার পাশ দিয়ে হেঁটে যায় দুই
যুবক-যুবতী
তাদের নিবিড় হাস্যময়তার মধ্যে আছে
কিন্নরলোকের দৃশ্য
পাশে পার্ক, সেখানে আনন্দে খেলে ঝাঁকঝাঁক দেবশিশু
হাতে হাতে আইসক্রিম, পায়ের তলায় ভাঙে
বাদামের খোসা
ঠিক এই সময়েই ঈথারে ছড়াচ্ছে এক কোকিল কণ্ঠীর গান
বেদনা-মধুর—

অপর বাড়ির কাজ সারতে লাগলো দেড় ঘণ্টা
ডেকচিটা রাখা রইলো সিঁড়ির তলায়
সেখানে ঘুরঘুর করে ফুটফুটে তিনটে বেড়াল
এ বাড়িতে শিশু নেই, বেড়ালেরা এতই আদুরে
সব সময় খাবারে অরুচি, তারা কিছুই ছোঁয় না
শুধু গন্ধ শোঁকে
মনিবানী দয়াবতী, সন্ধেবেলা পিয়ানো বাজান
এ বাড়িতে ঝি-চাকরও চা খায় দু'বার।

বড় রাস্তা পার হতে একবার হারানের মাকে
যে-গাড়িটা দিলে-দিতে-পারতো চাপা, তার গাঢ়
নীল রং, ঝকঝকে সুন্দর

ভিতরে কুকুর আর প্রভু—সকলি বিদেশী ।
সুললিত ঘণ্টা নেড়ে দমকল ছুটে যায়
অনির্দিষ্ট দূরের জগতে
নতুন বাড়ির গন্ধ, বারান্দায় সারি সারি টব
বিবাহ বাসর থেকে ভেসে আসে বিখ্যাত শানাই

রেল-লাইনের পাশে বস্তি, তার মুখটায় জমে আছে
পুরোনো কাদা ও জল, ইঁট ফেলে পথ
খড়-গোবরের গন্ধ, লণ্ঠনের বুক চাপা আলো
অসভ্য মেয়েলি হাসি, এবং ঝগড়ার ঐক্যতান ।
হারান হারিয়ে গেছে বহুদিন, নামটাই আছে
তাছাড়া রয়েছে বেঁচে আরও পাঁচটি এবং বৃদ্ধটি
হঠাৎ বাতাস এসে ধুয়ে গেল আধো অন্ধকার ঘরটাকে
সকলে চেঁচিয়ে উঠলো, কি, কি, কি, কি, কি, কি ?
বেশি হুড়োহুড়ি করে দু'জনে আছাড় খায়
তিনজন কাঁদে
সবচে ছোটটি ন্যাংটো, বেশি লোভী, ঢাকা খুলে
ভেতরে হাতটা ডোবাতেই
বুড়ো ধরে তার কান, চুল টানে
অন্যান্য ভায়েরা
যে এনেছে, সে শুধুই চেয়ে দেখে, ক্লান্ত পক্ষিমাতা ।

রেশনের সবটুকু আটা মেখে রুটি গড়া হলো
তোলা উনুনের আঁচে ছ' জোড়া চোখের দ্যুতি
অপেক্ষা মানে না
এ সময় জ্যোৎস্না ভেঙেছে বনে, নগরে নিওন
ছবির উৎসব আছে কোনোখানে
কোথাও বা অপ্সরীরা তুলেছে রঙের তীব্র ঝড়
আছে মৃত্যু, আছে দুঃখ, আছে শান্তি,
অনন্তের দীর্ঘ জেগে থাকা
এরই মধ্যে একবার দাঁড়াও সুন্দর,
এই অন্ধকার ঘরে ক্ষণকাল থেমে যাও
তোমার অনেক ছদ্মবেশ, অনেক ব্যস্ততা
তবু একবার দেখে যাও

সর্বাঙ্গ সমেত দুটি মুর্গী, চুরি নয়,
প্রকৃত মশলায় রান্না
তার সামনে মেলে থাকা চকচকে উৎসুক কটি চোখ
ক্ষুধার্ত মধুর হাসি
জীবনে প্রথমে কিংবা শেষবার, তবু এই মুহূর্তটি
তোমাকে চেয়েছে কাছাকাছি
অন্তত ন্যাংটো ও লোভী শিশুটির কাঁধে হাত
রাখো একবার।

উৎসব শেষে

অনেক উৎসবে ছিল আমাদের
ঘোর নিমন্ত্রণ
তাওয়া হয় না। পথগুলি বদলে যায় সকালে বিকেলে।
এমনও হয়েছে আমরা গেছি কোনো
বসন্ত-উৎসবে
ভুল দিনে, ভুল স্থান—সামনে পড়ে ছিল ধুধু মাঠ
তাতেই দারুণ সুখ, ধুলোয় গড়িয়ে
খুব হাসাহাসি হলো
তারপর বাড়ি ফেরা, রোগা একটা রাস্তা ধরে,
অন্ধকারে,
বহুক্ষণ হেঁটে হেঁটে
একা
সমস্ত উৎসব শেষে ফিরে গেছি
সেই রোগা রাস্তা ধরে
বহুক্ষণ হেঁটে হেঁটে
একা।

মন ভালো নেই

সূচিপত্র

বেলা গেল ৪৭, মন ভালো নেই ৪৭, বাসনা আমার ৪৮, নবান্নতে ফিরে গেছে কাক ৪৯, বনমর্মর ৪৯, ভ্রমণ কাহিনী ৫০, দূরের বাড়ি ৫১, দেহতত্ত্ব ৫২, লাইব্রেরিতে ৫৩, ঝর্নার পাশে ৫৪, কবিতা মূর্তিমতী ৫৫, শিশুরক্ত ৫৬, নির্বোধ ৫৬, ছায়ার জন্য ৫৭, তোমার কাছেই ৫৭, জলের কিনারে ৫৮, কিছু পাপ ছিল ৫৯, শূন্যতা ৫৯, চরিত্রের অভিধান ৫৯, অন্য ভ্রমণ ৬১, চুপ করে আছি তাই ৬২, বিদায় ও বিস্মৃতি ৬৩, লোকটি ৬৩, ধ্যানী ৬৪, যাত্রা ৬৭, শরীরের ছায়া ৬৭, শীত এলে মনে হয় ৬৮, পথের রাজা ৬৯, দুঃখ ও জানে না ৭০, ঘুরে বেড়াই ৭০, তোমার খুশির জন্য ৭১, এখনো সময় আছে ৭২, সে কোথায় ৭৩, ছবি খেলা ৭৪, চাসনালা ৭৫, ভাই ও বন্ধু ৭৬, প্রবাস ৭৭, সুন্দরের পাশে ৭৮, তুমি জেনেছিলে ৭৯, প্রতীক্ষায় ৭৯, সেদিন বিকেলবেলা ৮০, সে কোথায় যাবে ? ৮০, তমসার তীরে নগ্ন শরীরে ৮১, যে আমায় ৮২, স্বপ্নের কবিতা ৮৩, জেনে গেছি ৮৩, হলুদ পাখিরা ৮৪, আমার গোপন ৮৫, জল বাড়ছে ৮৬

বেলা গেল

যাবার কথা ছিল ফেরার পথ নেই
এখন বেলা গেল।
দেখেছি নিমফুলে বসেছে মৌমাছি
এখানে মধু আছে ?
দেখেছি বিষাদের দীর্ঘ তটরেখা
তবুও দিন ছিল
যেমন পাহাড়ের মুকুটে হেম শিখা
এবং তার পিছে
পিশাচী সভ্যতা ঝড়ের ছল করে
ওড়ায় পারাবত
দেখেছি বনভূমি অগ্নিমালা পরে
রাত্রি চমকায়
জেনেছি মৃত্যুর আড়ালে খেলা করে
স্নেহের শৈশব
যাবার কথা ছিল ফেরার পথ নেই
এখন বেলা গেল।

মন ভালো নেই

মন ভালো নেই মন ভালো নেই মন ভালো নেই
কেউ তা বোঝে না সকলি গোপন মুখে ছায়া নেই
চোখ খোলা তবু চোখ বুজে আছি কেউ তা দেখেনি
প্রতিদিন কাটে দিন কেটে যায় আশায় আশায়
আশায় আশায় আশায় আশায়
এখন আমার ওষ্ঠে লাগে না কোনো প্রিয় স্বাদ
এমনকি নারী এমনকি নারী এমনকি নারী
এমনকি সুরা এমনকি ভাষা
মন ভালো নেই মন ভালো নেই মন ভালো নেই
বিকেল বেলায় একলা একলা পথে ঘুরে ঘুরে
একলা একলা পথে ঘুরে ঘুরে পথে ঘুরে ঘুরে
কিছুই খুঁজি না কোথাও যাই না কারুকে চাইনি

কিছুই খুঁজি না কোথাও যাই না
আমিও মানুষ আমার কী আছে অথবা কী ছিল
আমার কী আছে অথবা কী ছিল
ফুলের ভিতরে বীজের ভিতরে ঘুণের ভিতরে
যেমন আগুন আগুন আগুন আগুন আগুন
মন ভালো নেই মন ভালো নেই মন ভালো নেই
তবু দিন কাটে দিন কেটে যায় আশায় আশায়
আশায় আশায় আশায় আশায়
আশায় আশায়…

বাসনা আমার

যতদিন পারি আমার নীল পেয়ালায়
পান করে যাবো ক্ষণিকের কৌতুক
বাসনা আমার, হে মর্ত্য লোভী বাসনা,
বিশাল ডানায় সন্ধ্যা যে মধুভুক্
বিহঙ্গমের বন্দনা গান গায়—
বাসনা আমার, হে মর্ত্য লোভী বাসনা,
তাকে কি পারি না দিতে আমি যৌতুক
এই পৃথিবীটা নিত্য অবহেলায়
বারে বারে ভরে অনিত্য নীল পেয়ালা !

কোথাও পাহাড়ে আগুন জ্বেলেছে কেউ
মাদলে দ্রিমিক দূর থেকে শোনা যায় ।
চিঠিবাহী উড়ো জাহাজে মেঘের ঢেউ
পাগলা ঘন্টি বাজে কি জেলখানায় ?
নগরে বাজারে স্বর্ণ লোভীর ফেউ
সোনালি রৌদ্র কাঞ্চনজঙ্ঘায় !

আমি কেউ নই সম্মিলিত এ সুরে
যারা কাছে ছিল তারা আজ বহুদূরে
টেলিপ্রিন্টারে ছিন্নভিন্ন পৃথিবী
সকলেই বলে, কী দিবি, কী দিবি, কী দিবি ?

বাসনা আমার, হে মর্ত্য লোভী বাসনা,
তুমি কি এখনো নিরালায় ভালোবাসো না
পান করে যেতে ক্ষণিকের কৌতুক ?
সাথী কেউ নেই ? আয়নায় কার মুখ ?

নবান্নতে ফিরে গেছে কাক

কোকিল কি ডেকে উঠেছিল ?
সে ভালো করেনি
তখন যে কথা ছিল
নতুন ধানের সুগন্ধের !
নবান্নতে ফিরে গেছে কাক !

বৃষ্টির ফোঁটা কি জুঁই ফুল ।
ঠিক যে মেলে না
বাঁধ ভেঙে ডুবেছে প্রাচীন
শিশুটিও ডুবে গেছে বানে

দূরে কারা হেঁটে ফিরে যায়
কাছে কি কখনো আসবে না ?
হাস্নুহানাতে দেখি সাপ
পাপ নেই কাগজে কলমে

কোকিল কি ডেকে উঠেছিল ?
সে ভালো করেনি
নবান্নতে ফিরে গেছে কাক ।

বনমর্মর

সেই পথ দিয়ে ফিরে যাওয়া
পড়ে আছে মিহিন কাচের মতন জ্যোৎস্না
শুকনো পাতার শব্দ এমন নিঃসঙ্গ

সেই সব পাতা ভেঙে
ভেঙে ভেঙে ভেঙে ভেঙে চলে যেতে
যেতে যেতে যেতে যেতে
বাতাসের স্পর্শ যেন কার যেন কার যেন কার
যেন কার ?
মনেও পড়ে না ঠিক যেন কার নরম অঙ্গুলি
এই মুখে, রুক্ষ মুখে, আমার চিবুকে, এই
কর্কশ চিবুকে
ঠোঁটে, ঠোঁটের ওপরে, এবং ঠোঁটের নিচে
চোখের দু'পাশে যে কালো দাগ
সেখানেও
যেন কার, যেন কার কোমল অঙ্গুলি
কপালে হিঙ্গুল টিপ, নীলরঙা হাসি
পেছনে তাকাই আর দেখা যায় না
জ্যোৎস্না নেই, বোবা কালা অন্ধকার
শুকনো পাতার শব্দ...
সেই পথ দিয়ে ফিরে যাওয়া, ফিরে যেতে যেতে যেতে ।

ভ্রমণ কাহিনী

আমার খুব কুচবিহার যেতে ইচ্ছে হয়
কেননা কুচবিহারের প্রতিটি শিশুর মুকুটে সাপের মাথার মণি
আমার ইচ্ছে করে আমি ওদের ব্রতচারীর সঙ্গী হই ।
কুচবিহারের প্রেতচ্ছায়া গাছে গাছে ঠিকানা লেখা চিঠি ঝুলছে
হলুদ পোশাক পরা যৌবন ওখানে মধ্য রাত্রির চাঁদের তলায় এসে
পাশা খেলে
কুচবিচারের ভূমধ্যহ্রদ থেকে ছিটকে ওঠে অশ্বমেধের ঘোড়া
আমার দিকে হ্রেষার হাস্য ছুঁড়ে দেয়
আমি তর্জনীতে আঙুলে ঠেকিয়ে বলি, চুপ, আমি যাচ্ছি ।
রবীন্দ্রনাথের প্রচার সচিবের চাকরি নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরতে ঘুরতে
আমার একদিন ইচ্ছে করে কুচবিহার যেতে
ওখানকার জ্যোতির্ময় বিকেলবেলায় সবুজ মখমলে শুয়ে
ক্রমশ হারিয়ে যাই

কুচবিহারের ন্যাসপাতি গাছে বসা পাখির একটা পালকের জন্য
আমার সমস্ত ছেলেবেলার দুঃখ মুচড়ে ওঠে
অভিমানে ইচ্ছে হয় রেললাইন উপড়ে লণ্ডভণ্ড করতে,
বিবর্ণ কোন চাষীকে সেচকার্যের জন্য আমি আমার চোখের
জল ধার দিতে চাই।
কুচবিহারের নারীরা স্বর্গের খুব কাছাকাছি বলে উদ্ভিন্ন যৌবনা
জলপরীর মতন তারা আমাকে একমুহূর্তের মায়া দেবে বলেছিল।
তারা 'আনি মানি জানি না পরের ছেলে মানি না' খেলতে খেলতে
আমাকে এসে ছুঁয়ে দিল
তারা আমাকে তাদের বিশাল উরসে জড়িয়ে ধরে বললো,
তুমি খেজুর গাছ কিংবা শজারু—তা জানি না
আমাদের ছোঁয়ায় সবই দেবদারু।

দূরের বাড়ি

অন্ধকার প্রান্তরের মধ্যে শুধু একটি
আলো-জ্বালা বাড়ি
রাত্রির সমুদ্রে জাহাজের মতন, হঠাৎ
মনে হয় সত্যিই ভাসমান
বাড়িটির প্রতিটি ঘরে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ,
কিংবা হাজার হাজার ঝাড়লণ্ঠন—
অথচ ওখানে যাবার কোনো
পথ নেই
এত অন্ধকার, এত নিঃসঙ্গ, হারিয়ে-যাওয়া
প্রান্তরের মধ্যে
ঐ বাড়িটি কেন ? কেন ? দূরে গাছের নিচে
দাঁড়িয়ে আমি কোনো
উত্তর পাই না।

দেহতত্ত্ব

কী ঘর বানাইছে দ্যাখো সাহেব কোম্পানি
এক অঙ্গে লক্ষ মুখ শতেক বাখানি
কী ঘর বানাইছে দ্যাখো সাহেব কোম্পানি ।

ঘরের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড ঘরেই পুষ্করিণী
তারই মধ্যে উথাল পাথাল ঘরের মানুষ যিনি
আহা কী ঘর বানাইছে দ্যাখো…

ঘরে ভোমরা গুনগুন করে ঘরে ডাকে ময়না
আর চক্ষের জলে হাপুস হুপুস ঘরে কেহই রয় না
আহা কী ঘর বানাইছে…

ঘরে ইন্দুর ঘুরঘুর করে বিড়ালে ধায় পিছে
আর ইন্দুর বিড়াল দুই বন্ধু একসঙ্গে হাসিছে
আহা কী ঘর…

ঘরের শোভার নাই তুলনা রোশনি হাজার হাজার
ঘরের মধ্যে নিউ মারকিট ঘরেই চোরাবাজার
আহা….

ঘরের দেয়াল ফঙ্গবেনে প্রলয় নাচে বাইরে
সুনীল ক্ষ্যাপা কয়রে আমি তাইরে নাইরে নাইরে
আমি তাইরে নাইরে নাইরে

রাজকুমারী

ভোরে উঠে মুখ দেখি রাজকুমারীর
ঠোঁটে প্রজাপতি রং
এত অনভিজ্ঞ চোখ শুধু ভোরবেলা দেখা যায়
বারান্দায় দাঁড়ালো সে
শৌখিন মাঝিকে হাতছানি দিতে
সংবাদপত্রেরও আগে কলকাতার অস্পষ্ট প্রত্যূষ
তার চুলে শোভা দেয়
এবং সূর্যেরও সাধ হয় ছুঁয়ে দিতে !

আমি তো দর্শক নিষ্পলক
রাজকুমারীর আলো মেখে নিই চোখে মুখে
সারা গায়ে
শুধু মনে হয়, কোন দেশ ? কোন দেশ ?

লাইব্রেরিতে

লাইব্রেরির মধ্যে কেন পড়েছিল অর্ধবোনা উল ?
আপন মনেই যেন বলটি গড়িয়ে পড়ে ভুঁয়ে
এখানে সবাই অশরীরী
এখানে অরণ্য
একটি বা দুটি রৌদ্র বর্শা হয়ে ফুঁড়ে আছে
মনীষার দীর্ঘশ্বাস এখানে বাতাস ।

উলের বলটি খুব নিঃশব্দে লাফিয়ে যায় অন্ধকারে
পড়ে থাকে রক্তবর্ণ রেখা
ফরফর আওয়াজে ওড়ে একটি বইয়ের পাতা
যেন কিছু জানবার আছে
গ্রন্থকীট ডুবে থাকে লবণ সাগরে
চার্বাকপন্থীরা হাততালি দেয়
বাইজেন্টাইন সভ্যতার ঘুরে যায় ঘাড় ।

বাইরে থেকে ফিরে এসে দুটি হাত

তুলে নেয় কাঁটা
গাঢ় চাহনির মধ্যে কৌতুক বিস্ময়
অতৃপ্ত আত্মারা তাকে ছুঁতে চেয়ে এখন নীরব
নরম বুকের কাছে কাল্পনিক চুমু !
চেয়ারে.বসার আগে সে দু'বার দু'দিকে ঘুরেই
আচম্বিতে দেখে নেয়
সারা অঙ্গে জড়ানো পশম
ঠিক যেন ল্যাবিরিন্থে ঢোকার বিখ্যাত সতর্কতা
গ্রীস রোম তৎক্ষণাৎ ধন্যবাদ দিল
রাজকুমারীর মতো সে এখন কোন্ যুদ্ধে যাবে ?

ঝর্নার পাশে

ঝর্নায় ডুব দিয়ে দেখি নিচে একটা তলোয়ার
একটুও মর্চে পড়েনি, অতসী ফুলের মতো আভা
আমার হাতের ছোঁয়ায় হঠাৎ ভেঙে গেল তার ঘুম
তুলে নিয়ে উঠে আসি, চুপ করে বসে থাকি কিছুক্ষণ
কাছাকাছি আর কেউ নেই
যেন ঝর্নাটাই আমার হাতের মুঠোয়, রৌদ্রে দেখছি
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
মাঝে মাঝে এক একটা ঝিলিকে চোখ ঝলসে যায়
মনে হয় না বহু ব্যবহৃত, ঠিক কুমারীর মতন
কোথাও ঘোড়ার ক্ষুর বা রক্তের দাগ নেই,
শান্ত বনস্থলী
মাঝে মাঝে অনৈতিহাসিক হাওয়া
একটি মৌটুসী খুব ডাকাডাকি করছে তার সঙ্গিনীকে
জলের চঞ্চল শব্দ তাকে সঙ্গতি দেয়
আমার চোখের সামনে হু-হু করে পিছিয়ে যেতে
থাকে সময়
কয়েকটি শতাব্দী গাছের শুকনো পাতার মতন উড়তে থাকে
সেই রকম একটা শুকনো পাতা ভেঙে গুঁড়িয়ে
নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকি

মনে পড়ে, অথচ ঠিক মনে পড়ে না
শুকনো পাতাগুলি আমি নৌকোর মতন ভাসিয়ে দিই
ঝর্নার জলে।

কবিতা মূর্তিমতী

শুয়ে আছে বিছানায়, সামনে উন্মুক্ত নীল খাতা
উপুড় শরীর সেই রমণীর, খাটের বাইরে পা দু'খানি
পিঠে তার ভিজে চুল
এবং সমুদ্রে দুটি ঢেউ
ছায়াময় ঘরে যেন কিসের সুগন্ধ,
জানালায়
রৌদ্র যেন জলকণা, দূরে নীল নক্ষত্রের দেশ।

কী লেখে সে, কবিতা ? না কবিতা রচনা করে তাকে ?

সে বড় অস্থির, তার চোখে বড় বেশি অশ্রু আছে
পাশ ফেরা মুখখানি—
এখন স্তব্ধতা মূর্তিমতী
শাড়ির অমনোযোগে কোমরের নগ্ন বারান্দায়
একটি পাহাড়ী দৃশ্য
সবুজ সতেজ উপত্যকা
কেন বা নদীও নয় ? অথবা সে অপার্থিবা বুঝি !

কী লেখে সে, কবিতা ? না কবিতা রচনা করে তাকে ?

নগরে হঠাৎ বৃষ্টি, বৃষ্টিতে দুপুর ভেসে যায়
সে দেখেনি, সে শোনেনি কোনো শব্দ
যেন এক দ্বীপ
যেখানে হলুদ বর্ণ রক্তিমকে নিমন্ত্রণে ডাকে
অথবা সে জলকন্যা,
দু' বাহুতে হীরকের আঁশ

ক্রমশ উজ্জ্বল হয়, আঙুলে কলম চিত্রার্পিত
কী লেখে সে, কবিতা ? না কবিতা রচনা করে তাকে ?

শিশুরক্ত

বাসেল, অবোধ শিশু, তোর জন্য
আমিও কেঁদেছি
খোকা, তোর মরহুম পিতার নামে যারা
একদিন তুলেছিল আকাশ ফাটানো জয়ধ্বনি
তারাই দু'দিন বাদে থুতু দেয়, আগুন ছড়ায়—
বয়স্করা এমনই উন্মাদ !
তুই তো গল্পের বই, খেলনা নিয়ে
সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন বয়েসেতে ছিলি !
তবুও পৃথিবী আজ এমন পিশাচী হলো
শিশুরক্তপানে গ্লানি নেই ?
সর্বনাশী, আমার ধিক্কার নে !
যত নামহীন শিশু যেখানেই ঝরে যায়
আমি ক্ষমা চাই, আমি সভ্যতার নামে ক্ষমা চাই ।

নির্বোধ

ওরা যারা যখন তখন মরে
তাদের জন্য মায়া কান্না কেঁদেছে কুম্ভীরে
কুম্ভীরেরা যখন মরে তাদের জন্য কান্না
সাংবাদিকের ভাষায় ছোটে বন্যা

তুমি ভাবলে, আমি তো ভাই কারুর ইয়েয় কাঠি
দিইনি কক্ষনো
বরং মানবতার জন্য দিয়েছি দক্ষিণে ।
পুজোর সময় যে যায় আনতে রাঁড়-পাড়ার মাটি
তার ঘরেই রক্ত তোলে
বারো মাসের সাথী বেশ্যাটি !

তুমি ভাবলে ঝুট ঝামেলায় যে যাবে সে যাক
আমি বরং আড়ালে নির্বাক !
শিল্প ছিল সাপের ফণা, শিল্প ছিল রোদ
জীবন ছিল জীবন থেকে বড়
সে সমস্ত গপ্পো কথা মনে রেখেছে নিতান্ত নির্বোধ
ভিড়ে যাকে বলছে সবাই, হঠো ! আগে বাড়ো !

ছায়ার জন্য

কেউ কাছে নেই, ছায়া গেছে দূর বনে
ভাবনা ছড়ানো দিন
পাথর ভাঙছে পাথরের কারিগর
পশ্চিমে যায় আয়ু !

নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে নারী
বিরলে নিজেকে দেখা
কেউ কাছে নেই ছায়া গেছে দূর বনে
নারীর কিনারে নদী ।

যে কোন সোপান স্বর্গের সিঁড়ি ভেবে
একজন এসেছিল
প্রকৃত স্বর্গ সমুখে পেয়েও তার
ছায়ার জন্য শোক !

তোমার কাছেই

সকাল নয়, তবু আমার
প্রথম দেখার ছটফটানি
দুপুর নয়, তবু আমার
দুপুরবেলা প্রিয় তামাশা
ছিল না নদী, তবুও নদী
পেরিয়ে আসি তোমার কাছে

তুমি ছিলে না, তবুও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা !

শিরীষ গাছে রোদ লেগেছে,
শিরীষ কোথায়, মরুভূমি !
বিকেল নয়, তবু আমার
বিকেলবেলার ক্ষুৎপিপাসা
চিঠির খামে গন্ধ বকুল
তৃষ্ণা ছোটে বিদেশ পানে
তুমি ছিলে না, তবুও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা !

জলের কিনারে

আমার মন খারাপ, তাই যাই জলের কিনার
জল তো চেনে না, জল কঠিন হৃদয়
বিস্মরণ মূর্তিমান হয়ে থাকে জলের গভীরে
ছায়া পড়ে ! কার ছায়া ?
যে দেখে সে নিজেও চেনে না

জলে রাখি ওষ্ঠ, যেন কবেকার সেই ছেলেবেলা
প্রথম উরুর কাছে মুখ, বুক কেঁপে ওঠা
প্রথম নারীর ঘ্রাণ
আসলে তা ছেলেখেলা—আমি কাছাকাছি নারীকেই
শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে
ফ্রক পরা সশরীর মাঠে ছেড়ে দিই !

কোমল স্তনের পাশে অভিমান
হালকা মেঘের ছায়া
চোখ দুটি চলচ্চিত্র, দু'হাত বাড়িয়ে
হাহাকার করে বলি,
কাছে এসো !
একবার ধরা দাও !

এসবও কল্পনা, আমি খুব কাছাকাছি নারীকেই
শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে ঘন ঘোর দুঃখে মেতে থাকি
জলের কিনারে
জল তো চেনে না, জল কঠিন হৃদয় !

কিছু পাপ ছিল

স্নেহের ভিতরে কিছু পাপ ছিল
যেমন গ্রন্থের মধ্যে ঘুণ,
বিশ্বাসের মধ্যে কোনো শাপ ছিল
জতুগৃহে যেমন আগুন ?
স্নেহ কেন জেগে ওঠে সশস্ত্র উত্তরে,
বিশ্বাসও স্বৈরিণী হয় অন্ধকার ঘরে !

শূন্যতা

শূন্য খুব বিশাল যেমন পিনের মাথায় শূন্যতা
ভালোবাসার মতন আমি শূন্যতায় পথ হাঁটি
পথ ঘুরে যায় লেভেলক্রশিং পথ ঘুরে যায় চৌমাথায়
পথ ঘুরে যায় হোটেল রুমে, জানলা ভাঙা ছিটকিনি—
দেয়াল দ্যাখো দেয়াল, ঐ বাইরে দ্যাখো শূন্যতা

শরীর শুধু খেয়াল যেন ছেলেবেলার খুনসুটি
শরীর দিয়ে তোমায় চেনা মধ্যে থাকে শূন্যতা

চরিত্রের অভিধান

১ রূপসী

কোথায় তোমার রূপ, গ্রীবায় না চক্ষের মণিতে ।
অথবা স্তন-কোরকে, উন্মুক্ত জঙ্ঘায়, ঠিক জানি না ।

এক এক বয়েসে তুমি এক এক রূপিণী,
তোমার না, আমার বয়েসে !
কে আছে হেন পুরুষ, এক শরীরের রূপ
দেখে নিতে পারে
নিতান্ত এক জীবন, মর চক্ষে ?
কেউ পারে না, জানি !
অসতী দর্পিতা হলে রূপ আসে, স্ফুরিত অধরে
ঝলসাক্ মিথ্যে প্রেম, মোহিনী ভ্রূ-ভঙ্গে
লোভ রতি প্রবঞ্চনা, জাদুদণ্ড হাতে তুলে নিলে
কবিতায়, শিল্পে তার স্থান দিতে
হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে কিনা ?

২ বাচাল

ওদের সবার জন্য একটা পৃথক ভূমি খুঁজে দিতে হবে
বাচাল বুড়োর দল সারাক্ষণ
ছেলেখেলা নিয়ে মত্ত থাকে সেইখানে।
সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, আণবিক, অতি দানবিক
ক্রেমলিন-লণ্ডন-রোম-প্যারিস-পিকিং, সাদা বাড়ি
ঐ যে অদ্ভুত মুখ, উত্তেজিত ক্ষীণ মুষ্টি
জুলজুলে চোখ সারি সারি
ওরা নিজেদের জন্য তিন হাত মাটি খুঁড়ে নিক্।

৩ প্রতিপক্ষ

রোদ্দুর বৃষ্টির স্বাদ ঐ লোকটা
বেশি পেয়েছিল
বুক ভরে আজীবন ঐ লোকটা
নিশ্বাস নিয়েছে
পবিত্র ঘুমের স্বাদ, সমস্ত স্বপ্নের স্বর্গ,
স্বচ্ছ জীবনের
সব উপভোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করে
একলা ঐ লোকটা গেল বেঁচে !

চোখে চোখ রাখো বাহুতে শয়ান বাহু
ধমনী শোনাক্ দুই হৃৎস্পন্দন
মুখচন্দ্রিমা গ্রাসে ওষ্ঠের রাহু
পান করো এই দেহের তীব্র অমিয়
স্মৃতি যেন পায় রক্তবীজের আয়ু
পান করো এই দেহের তীব্র অমিয়
তবে, একা নয়, ছোটদেরও কিছু দিও !

অন্য ভ্রমণ

ঈষৎ ধারালো রোদে কুমীরের ডিম খোঁজে
মানুষ-শিশুরা
খাঁড়িতে জোয়ার
সারি সারি কূর্মকায় ম্যানগ্রোভ ঝোপে
ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ
অদূরে অরণ্যভূমি প্রত্যক্ষদর্শীর মতো স্থির
পাডোক গাছের শীর্ষে টিট্রিভের মন-কাড়া ডাক
তারই মধ্যে বেজে ওঠে স্টিমারের ভোঁ।

জাহাজ ঘাটার থেকে বিশ পা বাড়ালে
আবার বৃক্ষের দেশ, আবার নির্জন
বালিয়াড়ি ভেঙে ভেঙে হেঁটে যাও
ভাঙা শঙ্খ, ঝিনুক, কোরাল
পান্না রং জলে ঘোরে চুনী-রঙা মাছ
পাথরের পিঠে ধার, এখানে বসো না।

যদিও বাতাস নেই, তবুও চলায় ক্লান্তি নেই
যেন কেউ ডাকে
যেন কেউ বসে আছে বাঁকের আড়ালে—
ছিল
তীর ও জলের সীমা ঘেঁষে শুয়ে ছিল এক

পা-বাঁধা হরিণী

তখনো সামান্য প্রাণ, তখনো চোখের মধ্যে দ্যুতি
কাছে যাই
চার চক্ষু বিস্ময়ের পাল্লা দেয়
কে ওখানে, কেন ওকে, কোন অপরাধে ?
ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়াতেই
হামলে আসে ঢেউ
প্রতিটি পরের ঢেউ আগের ঢেউকে দীন করে
তটভূমি দূরে সরে যায়
জুতো না ভিজিয়ে আমি পিছু হটে
এবং ক্রমশ পিছু হটে, চেয়ে থাকি
জলের বিরাট জিভ হরিণীকে নিয়ে যায়
এবং অদৃশ্য করে নেয় !
আর একটু আগেও যদি নিত
তা হলে এ ভ্রমণকারীর নিঃসঙ্গতা
আরও একটু বিধুর হতো না !

চুপ করে আছি তাই

সে ভেবেছে, চুপ করে আছি তাই সকলি মেনেছি
সে জানে না, কোন তমসার পারে বাঁধা আছে তাঁবু
সে ভেবেছে, বকুল তলায় যাকে নিত্য দেখা যায়
সে কখনো দুপুর রোদ্দুরে আর একা বেরুবে না
সে ভেবেছে, জীবন দিয়েছে যাকে হলদে ঝুমঝুমি
খেলা ঘরে যার বেলা টুকিটাকি সান্ত্বনা পেয়েছে
সে কখনো দেখবে না, দু'হাতের সোনালি শৃঙ্খল !
সে জানে না, নদী প্রান্তে যে আছে সে চেনে সর্বনাশ !

বিদায় ও বিস্মৃতি

বিদায়ের পাশ থেকে উঠে যায় দুটিমাত্র স্মৃতি
ওরা ছিল, ওদের সময় হয়ে গেল
বিদায় হলুদ বর্ণ, ওরা কিন্তু হরিতে-হিরণে
সেজেছিল যৌবনের সাজ
সরু গলিপথ ওরা আলো করে দিয়ে গেল
এই শেষবার।

বিস্মৃতির পাশ থেকে ঝরে পড়ে এক বিন্দু স্বেদ
এমন শীতের বেলা, এমন মধুর জ্যোৎস্নারাতে
এ কি হলো ?
বিস্মৃতির রং ছিল শেষ মেঘ, সাংঘাতিকভাবে জেগে থাকা
এ জীবন যেমন উজ্জ্বল
তার পাশ থেকে কেন ঝরে পড়ে লবণাক্ত উষ্ণ এই কণা
কোথায় এ ছিল, কিংবা কোন্‌দিকে যাবে ?
কাকে যে শুধাই ? হায়, এর কথা বিদায় জানে না !

লোকটি

লোকটি ভীষণ ব্যস্ত এবং অহংকারী
লোকটি ভীষণ দামী এবং গেরেমভারি !
লোকটি দারুণ গাবগুবাগুব গুমসো গোসা
লোকটি দারুণ হাকুম চাকুম কাঁঠাল খোসা
তবু তাকেও ভয় পাবার তো কিচ্ছুটি নেই
মুখোশ খুলে এক মিনিটও কি ছুটি নেই ?
হলো বা তার চকচকাচক চটাস চামা
তোমার আমার মিনমিনে মিন মাগনা দামা ?
উপুড় হয়ে হাত পা ছুঁড়ে রাত্রি বেলা
সেও তো খেলে খাট বিছানায় একই খেলা !
তোমার আমার মতন তারও সর্দি হলে
হঠাৎ হঠাৎ শব্দ করেই গয়ের তোলে !

লোকটি ভীষণ ব্যস্ত এবং অহংকারী
লোকটি ভীষণ দামী এবং গেরেমভারি !
তবু তাকে ভয় পাবার তো কিচ্ছুটি নেই
মুখোশ খুলে এক মিনিটও কি ছুটি নেই ?

ধ্যানী

—সমস্ত পতন তুচ্ছ করে,
উঠে এসো !
—কোথায় তোমার হাত ?
—নির্লজ্জ ভিখারী, তুমি এখনো শরীর চাও ?
—এখনো কাটেনি নেশা
—চিবুকে চিমটি দিয়ে জাগাও নিজেকে
—তোমার চিবুকে ? তবে চিমটি কেন
চুম্বনেই বেশি সুখ
কচি পেয়ারার মতো ঐ থুতনি
উপমাবিহ্নী ঠোঁট, শুধু আস্বাদের
যোগ্য
—এ সবই পুরোনো কথা—
জেগে ওঠো,
শোনাও জ্যা-শব্দ এই ধরিত্রীকে
—এখনো কাটেনি নেশা
—গুহা ছেড়ে বাইরে এসো
ও তোমার যোগ্য জায়গা নয়
কঠিন পাথর, চামচিকের গন্ধ, অন্ধকার
—বড় বেশি অন্ধকার, ঠাণ্ডা, ভারী স্নিগ্ধ
—প্রমিথিউস কার ভাই ?
—আমারই, যদিও বৈমাত্রেয়
—বাইরে এসো ! কতদিন দেখিনি তোমাকে
—এ যেন প্রেমের ভাষা মনে হচ্ছে ?
ফের নেশা জমে উঠবে
হাতটা বাড়িয়ে দাও
টেনে আনি তোমাকেও এই কালো

মোলায়েম, আঁধার শয্যায়
—প্রেম কি নেশার বস্তু ? শুধু ঘাম ?
—কি বললে ? শুধু কাম !
মোটেই না !
ওষ্ঠের লাবণ্য স্পর্শ, সে কি কাম ?
কোমর জড়িয়ে ধরে শরীরের গন্ধ নেওয়া
কিংবা যদি মিলনের নেশা জাগে
কী মধুর তীব্র-খেলা
মিথ্যেবাদীরাই শুধু এর অন্য নাম দেয়
—শুধু খেলাতেই সব শেষ ? আর কিছু
কাজ নেই ?
—পূর্ববঙ্গে সব কাজকেই কাম বলে—
ওরা খুব দার্শনিক !
—আমি চলে যাই ?
—যাও না ! কে আটকাচ্ছে ? বাইরে কত আলো
শিরীষের ডালপালা ছুঁয়ে আছে নম্র ভোরবেলা
সমাজতন্ত্রের ভাষ্য মুখে নিয়ে
পাখি উড়ে যায়
ধারাবর্ষণের মধ্যে হেঁটে যান মাদার টেরেসা
সমুজ্জল প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন মানুষের ঘর
আমার তো ঈর্ষা নেই,
প্রকৃতির সঙ্গে আমি দ্বৈরথে নামি না ।
—তুমি এর বাইরে থাকবে ?
—ক্ষতি কি, দু' একজন যদি থেকে যায় এ-রকম ?
—এই নোংরা অন্ধকারে ? গড়ানো গুহায় ?
—আমার যে ধ্যান আজো শেষ হয়নি
ধ্যানী মাত্রই তো গুহাবাসী
তাই না ?
—বলো তো কিসের ধ্যান
—সে বিষম গুহ্যতত্ত্ব
—আমাকেও বলবে না ?
—একমাত্র তোমাকেই বলতে পারি
কেননা ধ্যানের লক্ষ্য তুমি !
—এ কেমন চাওয়া, যার শেষ লক্ষ্যে আত্মহত্যা ?

এ কেমন বেঁচে থাকা, যার কেন্দ্রে
জীবনের বিমুখতা ?
শরীর নীরব হয়, বাসনার ঘুম পায়
নদীও শুকিয়ে যায় এমন কি
—সবই তো বদলে যায়
—আর তুমি ?
—কেন এত জ্ঞান দিচ্ছো ? আসতে চাও এসো
কিংবা কেটে পড়ো
—আমি তো পতন চাইনি, আমি চাই,
তোমার উদ্ধার !
—অয়ি দয়াবতী, পৃথিবীতে-আর কোনো আর্ত নেই ?
করুণা-বিলাসী যদি হতে চাও
করুণা-ভিখারী তুমি ঢের পাবে
আমি বড় অহংকারী !
—কোথায় সে অহংকার ? যা তোমাকে
উঠে দাঁড়াবার শক্তি দেবে ?
যা তোমার স্নায়ুকে করবে তীক্ষ্ণ
কপাট ভাঙার আগে দীর্ঘশ্বাস ফুরোবে না
গ্রন্থের পিপাসা থেকে নদীর বাঁধের কাছে
মুক্তি দেবে জল
মানুষকে চিনে নেবে তোমার দর্পণে
—কি রকম চেনা চেনা কথাগুলো
কিছু দাড়িওয়ালা
মহাপুরুষের কারখানায়
হয় না এসব তৈরী ?
রাখো !
যদি চাও, উপহার দাও ঐ পিঙ্গল শরীর
আমার বুকের কাছে পা ছড়িয়ে বসো—
শান্তি দাও ! হে সুন্দর
মাধুর্যের ঝাপটা দাও, কানে কানে বলো
কোনো মর্মকথা
না হয়তো চলে যাও, কোনো খেদ নেই !
—যেতে হবে জানি ! এখনো তোমার নেশা
সত্যিই যায়নি দেখছি।

এর পর তুমি...
—আরও পতনের দিকে যাবো। পুনরায়
ধ্যানে বসবো
—কার ?
—কার আবার ? তোমারই তো
—আমাকে বিদায় করে আমাকেই ধ্যান করবে ?
—আমার ধ্যানের নেশা
আমি এই নিয়ে বেশ আছি !

যাত্রা

ভাঙা নৌকোয় যাত্রা, তবুও জায়গা আছে
টলমল করে সূর্যের ঘড়ি
পকেটে মাত্র এক কানাকড়ি
তবু যেতে হবে সীমানা ছাড়িয়ে অসীমার কাছে
ভাঙা নৌকোয় যাত্রা, তবুও জায়গা আছে।

অসীমা আমার বড় গরবিনী, নদীর মতো
যার তীরে নেই সহজ শান্তি
সে আমায় দেয় হাজার ভ্রান্তি
পথ ভুলে আমি পথেই নিজেকে খুঁজেছি কত !
যেতে হবে শেষে নিজেকে ছাড়িয়ে অসীমার কাছে
ভাঙা নৌকোয় যাত্রা, তবুও জায়গা আছে।

শরীরের ছায়া

ও চুলে তোমার বেণীবন্ধন কিছুতেই মানাবে না
চুল খুলে দাও হাওয়ায় অন্ধকারে
ও নীল বসনে ঝরুক লজ্জা, রেখাগুলি ঐ কাঁপে
দাঁড়াও এখানে পিপাসার পারে
হাওয়ায় অন্ধকারে !

ভুলতে চাই না নদী নীলিমার অশুভ কৌতূহলে
হাত বাঁধবো না গত জন্মের পাপে
ও দুটি চোখের তারার দ্যুতিতে পৃথিবীও বড় দীন
ও নীল বসনে ঝরুক লজ্জা, রেখাগুলি ঐ কাঁপে
মুখ ঢাকবো না গত জন্মের পাপে !

দাঁড়াও এখানে পিপাসার পারে
হাওয়ার অন্ধকারে
শরীরের ছায়া শরীরের লোভ করে।
যদি ভুল হয়, ছায়ার সঙ্গে যদি দূরে চলে যাই ?
তুমি তাই এসো রক্ত মাংসে, যে রকম আসে ফুল
গন্ধে গন্ধে মদির রাত্রি—এ রকম ছিল সাধ
শরীরের ছায়া শরীরের লোভ করে।

শীত এলে মনে হয়

মাঠ থেকে উঠে ওরা এখন গোলায় শুয়ে আছে
সোনালি ফসল, কত রোদ ও বৃষ্টির স্বপ্ন যেন
স্নেহ লেগে আছে
লাউমাচায়, গরু ও গরুর ভর্তা সবান্ধব পুকুরের পাশে
মুখে বিশ্রামের ছবি, যদিও কোমরে গাঁটে ব্যথা।

শীত এলে মনে হয়, এবার দুপুর থেকে রাত
মধুময় হয়ে যাবে, যে রকম চেয়েছেন পিতৃপিতামহ
তাঁদের মৃত্যুর আগে ভেবেছেন আর দুটো বছর যদি…
শীত এলে মনে হয়, এই মাত্র পার হলো সেই দু'বছর
এবার সমস্ত কিছু…
শীত চলে যায়, বছর বছর শীত চলে যায়,
সে দুটি বছর আর কখনো আসে না।

সমস্ত পৃথিবীময়

এই মুহূর্তে যে কাঁদলো তাকে কান্না থেকে মুক্তি দেবার
কোনো মন্ত্রই আমি জানি না—
সমস্ত পৃথিবীময় যেন ছড়িয়ে আছে আলগা অভিমান
কে কাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়—
কে হাসিমুখে ভেতরে ছুরি শানায়
তার কোনো ইতিহাস যেন কেউ কখনো না লেখে !

ভালোবাসার মধ্যেই শুয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি ভুল
প্রতিটি পল-অনুপলকে সন্দেহ হয়, সত্যি তো ?
শরীরের কাছে শরীর, আলিঙ্গনের মধ্যে তার নরম বুক
কী মধুর, কী সুন্দর, কী তীব্র যন্ত্রণা !
সেই সময়েও নিশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ শুনে শুনে মনে হয়
কার জন্য ? আমারই তো
কিছুতেই কেউ কখনো বোঝে না, সে পুরোপুরি আমার
একলা এসে বারান্দায় দাঁড়ালেই মনে হয়
সমস্ত পৃথিবীময় যেন ছড়িয়ে আছে আলগা অভিমান ।

পথের রাজা

পথের রাজাকে আমি দেখেছি গভীর রাত্রে
দৈবাৎ বারান্দায় এসে
তখনও বিপুল বৃষ্টি, আকাশ ভাসানো বৃষ্টি
রাত্রিকে বিহ্বল করা জল ছাঁট
সব ধুয়ে গেছে, সব কালো ও চিক্কণ,
গাছগুলি স্তব্ধ—জাগা, তারা পরস্পর
মুখ দেখে
আর কেউ নেই, বহুক্ষণ কেউ নেই, গাড়িরাও
ফিরে গেছে ঘরে
এমন নিশুতি ক্ষণে ধীর লয়ে
শব্দহীন পদপাতে হেঁটে যান
পথের সম্রাট

খালি গা, তামস রং, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল
ওষ্ঠে মৃদু হাসি,
এবং গুনগুন গান
শান্তভাবে দশ দিক দেখে
পথের সম্রাট ঠিক মাঝখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে
কোথায় বা কেন যান কিছুই বুঝি না !

দুঃখ ও জানে না

চোখে চোখ লেগে থাকে
শরীর নীরব
হরিৎ আভার মতো স্মৃতি জানে
সেরকম ভাষা—
ইতিহাস কিংবা তারও আগে থেকে
মানুষের যাবৎ পিপাসা
চোখে চোখ রেখে দেয়—শব্দ করে
নৈঃশব্দ্যের স্তব ।
আমার চোখের কোণে লেগে আছে
হিম দুঃখ স্মৃতি
দুঃখ ও জানে না
দূর অন্ধকারে পোড়ে কার শব !

ঘুরে বেড়াই

তোমার পাশে, এবং তোমার ছায়ার পাশে
ঘুরে বেড়াই
তোমার পোষা কোকিল এবং তোমার মুখে
বিকেলবেলা রোদের পাশে
ঘুরে বেড়াই
তোমার ঘুমের এবং তোমার যখন তখন অভিমানের
অর্থ খুঁজি অভিধানে
ঘুরে বেড়াই ঘুরে বেড়াই

গাছের দিকে মেঘের দিকে
বেলা শেষের নদীর দিকে
পথ চেনে না পথের মানুষ
ঘুরে বেড়াই ঘুরে বেড়াই
মেলা শেষের ভাঙা উনুন ছাইয়ের গাদায়
ল্যাজ গুটানো একলা কুকুর
পুকুর পাড়ে মাটির খুরি, সবুজ ফিতে
ঘুরে বেড়াই ঘুরে বেড়াই
তোমার পাশে এবং তোমার ছায়ার পাশে
ঘুরে বেড়াই।

তোমার খুশির জন্য

যদি আর আমি কিছুই না লিখি ?
সব ছেড়ে ছুড়ে বনবাসী হই, তুমি খুশি হবে ?

সে বন এখনো মানুষ চেনে না
আমি ছাড়া কেউ একলা যাবে না
এবং ফেরার কোনো পথ নেই
তুমি খুশি হবে ?

যা লিখেছি সব পুড়িয়ে ছড়িয়ে
চাঁড়ালের হাতে ছাই সঁপে দিয়ে
যদি চলে যাই ?

সমস্ত নাম উকো দিয়ে ঘষে
মুছে দিয়ে যাবো
আমার জন্য কাঁদবে না কোনো শিয়াল কুকুরও
তুমি খুশি হবে ?

তোমার খুশির জন্য আমি কি পৃথিবী ছাড়বো ?
যদি চাও, তাও ছেড়ে যেতে পারি

হে সমালোচক, আরও যা চাইবে সব মেনে নেবো
শুধু দয়া করে, আমাকে কখনো
আর তুমি ভালো লিখতে ব'লো না !

এখনো সময় আছে

(একটি ফরাসী কবিতার ভাব-অনুসরণে)

তখন তোমার বয়স আশী, দাঁড়াবে গিয়ে আয়নায়
নিজেই বিষম চমকে যাবে, ভাববে এ কে ? সামনে এ কোন্ ডাইনী ?
মাথা ভর্তি শণের নুড়ি, চামড়া যেন চোত-বোশেখের মাটি
চক্ষু দুটি মজা-পুকুর, আঙুলগুলো পাকা সজনে ডাঁটা !
তোমার দীর্ঘশ্বাস পড়বে, চোখের কোণে ঘোলা জলের ফোঁটায়
মনে পড়বে পুরোনো দিন, ফিসফিসিয়ে বলবে তুমি,
আমারও রূপ ছিল !
আমার রূপের সুনাম গাইতো কত শিল্পী-কবি !
তাই না শুনে পেছন থেকে তোমার বাড়ির অতি ফচকে দাসী
হেসে উঠবে ফিকফিকিয়ে
রাগে তোমার শরীর জ্বলবে ! আজকাল আর ঝি-চাকরের নেই কোনো
ভব্যতা !
মুখের ওপর হাসে ? এত সাহস ? তুমি গজগজিয়ে যাবে অন্য ঘরে
আবার ঠিক ফিরে আসবে, ডেকে বলবে, কেন ?
কেন রে তুই হাসিস ? তোর বিশ্বাস হলো না ?
আমারও রূপ ছিল, এবং সে রূপ দেখে পাগল
হয়েছিলেন অনেক লোকই, এবং কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় !
দাসীটি তার চোখ তুলবে কপাল জুড়ে, প্রকাশ্যেই বলবে
এবার বুঝি মাথা খারাপ হলো তোমার, বুড়ীমা ?
আবোল তাবোল বকছো তুমি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ?
সবাই যাঁকে শ্রদ্ধা করে, যাঁর কবিতা সবার ঠোঁটে ঠোঁটে
প্রতিবছর জন্মদিনে যার নামে হয় কয়েক ঘণ্টা বেতারে গান বাজনা
সেই তিনি, সেই কবি এমন বুড়ীর জন্য পাগল
হয়েছিলেন ? হি হি হি হি এবং হি হি হি হি
রাগে তোমার মুখের চামড়া হয়ে উঠবে চিংড়ি মাছের খোসা

তুমি ভাববে, এক্ষুনি সুনীলকে ডেকে যদি সবার
সামনে এনে প্রমাণ করা যেত।
কিন্তু হায়, কী করে তা হবে ?
সেই সুনীল তো মরেই ভূত পঁচিশ বছর আগে
কেওড়াতলার চুল্লিতে তার নাভির চিহ্ন খুঁজেও পাওয়া যায়নি !

তাই তো বলি, আজও সময় আছে
এখন তুমি সাতাশ এবং সুনীলও বেশ যুবক
এখনও তার নাম হয়নি, বদনামটাই বেশি
সবাই বলে ছোকরা বড় অসহিষ্ণু এবং মতিচ্ছন্ন
লেখার হাত ছিল খানিক, কিন্তু কিছুই হলো না।

তাই তো বলি, আজও সময় আছে
দাঁড়াও তুমি অখ্যাত বা কুখ্যাত সেই কবির সামনে
সোনার মতো তোমার ঐ হাত দু'খানি যেন ম্যাজিক দণ্ড
বলা যায় না, তোমার হাতের ছোঁয়া পেয়ে একদিন সে হতেও পারে
দ্বিতীয় রবি ঠাকুর !
তোমার সব রূপ খুলে দাও, রূপের বিভায় বন্দী করো
তোমার রূপের অরূপ রঙ্গ তাকে সত্যি পাগল করবে
তোমার চোখ, তোমার ওষ্ঠ, তোমার বুক, তোমার নাভি···
তোমার হাসি, অভিমানের গুচ্ছ গুচ্ছ অশোক পুষ্প···
কিন্তু তুমি তখনই সেই সুনীল, সেই তোমার রূপের পূজারীর
চুলের মুঠি চেপে ধরবে, বলবে, আগে লেখো !
শুধু মুখের কথায় নয়, রক্ত লেখা ভাষায়
কাব্য হোক রূপের, শ্লোক, অমর ভালোবাসায় !

সে কোথায়

বালির ওপরে কার তাজা রক্ত ? এদিকে ওদিকে
চেয়ে দেখি
কোনো হিংস্র পশু বুঝি বিদ্যুৎ চমকে এসেছিল ?
বাতাসে নিষ্পাপ গন্ধ, কেউ নেই, সমস্ত শব্দও
চুপ করে আছে

উড়ন্ত আঁচল যেন নদীটির ঢেউ,
হালকা মেঘের ছায়া
ঈষৎ কিনারে এসে পা ডুবিয়ে আমি
হেঁট মুখে স্থির চেয়ে থাকি
বালির ওপরে কার তাজা রক্ত ? এই ছায়াময় দিনে
লুকিয়ে রয়েছে কোন হত্যাকারী ? সে কোথায় ?

ছবি খেলা

মনে আছে সেই রাত্রি ? সেই চাকভাঙা
মধুর মতন জ্যোৎস্না
উড়ো উড়ো পেঁজা মেঘ অলীক গর্ভের প্রজাপতি
দুগ্ধবর্ণ বাতাসের কখনো স্পর্শ ও ছবি খেলা
মিনারের মতো পাঁচটি প্রাচীন সুউচ্চ গাছ, সেই
মানবিক চষা মাঠ, তিনটি দিগন্ত দূর, আরও দূর
পুকুরের ঢালু পাড়ে তুমি শুয়ে ছিলে
মনে আছে সেই রাত্রি, সঠিক পথেই ঠিক
ভুল করে যাওয়া ?

বুকে কেউ চোখ ঘষে, উরুদ্বয়ে ভেঙে যায় ঘুম
হঠাৎ প্রবাসী গল্প, ফিসফাস, শব্দ এসে
শব্দকে লুকোয়
অশ্রুর লবণ থেকে উঠে আসে স্মৃতিকথা, পিঠে
কাঁকর ও তৃণাঙ্কুর, অথচ এমন রাত্রি, এমন
জ্যোৎস্নার মৃদু ঢেউ
কখনো দেখোনি কেউ সমস্ত শরীরে আলো যেন
খুব জলের গভীরে
সাবলীল ভেসে যাওয়া, কত দেশ, কত নদী
এমনকি মানুষজন্ম পার হয়ে এসে
যেমন ফুলের বুকে ঘ্রাণ কিংবা ঘ্রাণ ছেঁচে
জন্ম নেয় ফুল
মনে পড়ে সেই রাত্রি ? সঠিক পথেই ঠিক
ভুল করে যাওয়া ?

সারা দুনিয়ায়

সারা দুনিয়ায় এক দুর্নিবার চ্যাঁচামেচি, কেড়ে নিতে হবে !
হবেই তো !
যে না নেবে, তার মৃত্যু গাছের ডগায় !

সারা দুনিয়ায় আজ অবিশ্রান্ত হুড়োহুড়ি। কাল যেন শেষ
তার চিহ্ন,
সূর্যাস্তের লাল আভা, পাশে পোড়া ছাই !

সারা দুনিয়ায় আজ লজ্জাহীন রেষারেষি, কে পাবে অগ্রিম
হাত খোলা,
যে-হাত দেয় না কিছু, শুধু সব নেবে !

সারা দুনিয়ায় আজ সার্থকতা—মৃত্যুপণ, তারই নাম সুখ
দেখা যায়
নদীর অপর তীরে তার অন্য ভাই বসে আছে !

সকলেই যা চেয়েছে, ধরা যাক একদিন তাই পেয়ে গেল
তবু দেখো,
কবিতা লেখার জন্য ক'জন মানুষ শুধু,
কিছুই চাইবে না !

চাসনালা

এসেছে হাজারে হাজারে মানুষ, এসেছে, দেখেছে,
হাজারে হাজারে মানুষ এসেছে, দেখেছে
এসেছে পুলিশ, জিপ, ভ্যান, ট্রাক, এসেছে অনেকে ক্যামেরা ঝুলিয়ে
এসেছে গ্রামীণ, এসেছে বিদেশী,
এসেছে শ্রমিক, এসেছে মালিক
এসেছে ভিস্তি, এসেছে বাদাম, ছোলা, কোকাকোলা
হালুয়া বরফি, গুলাবি রেউড়ি
এসেছে হাজারে হাজারে মানুষ, এসেছে, দেখেছে

হাজারে হাজারে মানুষ এসেছে, দেখেছে
এসেছে ব্যাকুল, এসেছে ক্রুদ্ধ, এসেছে মলিন
এসেছে শিশুরা, এসেছে মেয়েরা, এসেছে অন্ধ
আরো আসে আরো গাড়ির শব্দ, পায়ের শব্দ
আরো আসে আরো, আরো, আরো, আরো
এসেছে হাজারে হাজারে মানুষ, এসেছে, দেখেছে
হাজারে হাজারে মানুষ এসেছে, দেখেছে
দেখেছে ? দেখেছে ? সত্যি দেখেছে ?
দেখেনি কিছুই, দেখেনি কিছুই, দেখেনি কিছুই
ও ওর মুখের, সে তার মুখের
কে কার মুখের দিকে চেয়ে দেখে, দেখেনি, দেখেনি,
কিচ্ছু দেখেনি···

ভাই ও বন্ধু

আমার যমজ ভাই দুঃখ, আজ বহুদিন পলাতক
তার খোঁজে ইতিউতি যাবো—ইদানীং সময় পাই না
মাঝে মাঝে কেউ বলে, তোমার ভাইকে কাল দেখলুম হে
চুপচাপ জারুল গাছের নিচে বৃষ্টিতে ভিজছিল !
একটু আনমনা হই, উপন্যাস লেখা থেকে চোখ তুলে
সাদা দেয়ালের দিকে···
গুপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে নিজেকে ঠকিয়ে বলি
সে অনেক বদলে গেছে,
সে আর আমার মতো নেই
আমার যমজ ভাই দুঃখ, আজ বহুদিন পলাতক !

আমার বন্ধুর নাম চিরঋতু, সে অনেক
আগেকার কথা
তখন বাতাস ছিল হিরণ্ময়
তখন আকাশ ছিল অতি ব্যক্তিগত
তখন মাংসের লোভে যাইনি আমরা কেউ উঁচু প্রতিষ্ঠানে
তরল আগুন খেয়ে মাঝরাতে দেখিয়েছি হাজার ম্যাজিক
তখন বাতাস ছিল···তখন আকাশ ছিল··· সে অনেক

আগেকার কথা !
এখন অন্যের বাড়ি অকস্মাৎ ঢুকে পড়লে সব কথা
থেমে যায়
বিষয় বদলাতে গিয়ে গ্রীষ্মকালে কেউ শীতে কাঁপে
এমন কি নারীরাও…
আমার কঠিন মুখ, আচমকা কর্কশ বাক্য…নিজেই চমকে উঠি
যেন এক রণক্ষেত্র, পিঠ ফেরালেই আছে শত শত তীর
আমার বন্ধুর নাম চিরঋতু…চিরঋতু ? ঠিক নাম
মনে রেখেছি তো ?

প্রবাস

যাবে কি এবার বসন্তেই ?
আসছে শ্রাবণে
এসেছে শ্রাবণ, শোনো মেঘের গর্জন
আর দু'টো মাস
আশ্বিনের সাদা মেঘে ভরুক প্রবাস

আশ্বিনেও লেগে ছিল লোভ
শীত মদালসা
ফেরার অনৈক্য ছিল গ্রীষ্মে
কেটেছে বছর
এমন কি শেষ দিনে এলো ঘূর্ণিঝড় !

যাবে কি শতাব্দী সাঙ্গ হলে ?
না, না, তার আগে
অস্থিরতা রোদে কম্পমান
আর দেরি নেই
প্রাক্তন স্বদেশে ফেরা এই মুহূর্তেই !

সুন্দরের পাশে

সে এত সুন্দর, তাই তার পাশে বসি
রূপের বিভায় আমি সেরে নিই লঘু আচমন
রূপের ভিতর থেকে উঠে আসে বুক ভরা ঘুম
আমি তার চোখ থেকে তুলে নিই
মিহিন ফুলের পাপড়ি
গন্ধ শুঁকি, পুনরায় ঘুম থেকে জাগি
উজ্জ্বল দাঁতের আলো রক্তিম ওষ্ঠকে বহু দূরে নিয়ে যায়
রূপের সুদূরতম দেশে চলে যাবে এই ভয়ে
আমি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে…
সে এত সুন্দর তাই তার পাশে বসি !

রূপ যেন অভিমান, আমি কোনো সান্ত্বনা জানি না
যতখানি নিতে পারি, দিই না কিছুই
জানলার পাশ দিয়ে উঁকি মারে কার ছায়া ?
ওকি প্রতিদ্বন্দ্বী ?
ওকি নশ্বরতা ?
শিখেছি অনেক কষ্টে তার চোখে ধুলো দেওয়া
এই শিল্পীরীতি
চিরকাল না হলেও, বারবার ফেরানো যাবেই জেনে
রূপ থেকে সুধা পান করি
ঠিক উন্মাদের মতো চোখ থেকে ঝরে পড়ে হাসি ।

প্রকৃতির অলঙ্কার সে রেখেছে অনন্ত সীমানা জুড়ে জুড়ে
তাই প্রকৃতির কাছে অন্ধ হলে যাবো
সুমেরু পর্বতে আমি মাথা রাখি
সমুদ্রেরঢেউ লাগে হাতের আঙুলে
উরুর ভিতরে অগ্নি…এত মোহময়…
অরণ্যের গন্ধ মাখা…
নিশ্বাসে পলাশ ঝড়, বারবার
যুদ্ধের সুমিষ্ট স্বপ্ন, চোখ ঘুরে ঘুরে
যায়, আসে
নরম সোনালি দুই বুক যেন স্বর্গভূমি

এত মোহময়, তাই শিল্প…
যুদ্ধের অমর শিল্প…
সে এত সুন্দর তাই তার পাশে বসি !

তুমি জেনেছিলে

তুমি জেনেছিলে মানুষে মানুষে
হাত ছুঁয়ে বলে বন্ধু
তুমি জেনেছিলে মানুষে মানুষে
মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়
হাসি বিনিময় করে চলে যায়
উত্তরে দক্ষিণে
তুমি যেই এসে দাঁড়ালে—
কেউ চিনলো না কেউ দেখলো না
সবাই সবার অচেনা !

প্রতীক্ষায়

গোলাপে রয়েছে আঁচ, পতঙ্গের ডানা পুড়ে যায়
হাওয়া ঘোরে দূরে দূরে
ফুলকে সমীহ করে
সূর্যাস্তও থমকে থাকে !

দেখো দেখো
আমার বাগানে এক অগ্নিময়
ফুল ফুটে আছে
তার সৌরভেও কত তাপ !
আর সব কুসুমের জীবন চরিত তুচ্ছ করে
সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে চতুর্দিকে
বৈদূর্যমণির মতো চোখ মেলে সে রয়েছে প্রতীক্ষায়
কার ? কার ?

সেদিন বিকেলবেলা

সাতশো একান্নতম আনন্দটি পেয়েছি সেদিন
যখন বিকেলবেলা মেঘ এসে
ঝুঁকে পড়েছিল
গোলাপ বাগানে
এবং তোমার পায়ে ফুটে গেল লক্ষ্মীছাড়া কাঁটা !
তখন বাতাসে ছিল বিহ্বলতা, তখন আকাশে
ছিল কৃষ্ণ কান্তি আলো,
ছিল না রঙের কোলাহল
ছিল না নিষেধ
অতটুকু ওষ্ঠ থেকে অতখানি হাসির ফোয়ারা
মন্দিরের ভাস্কর্যকে ম্লান করে নতুন দৃশ্যটি ।

এর পরই বৃষ্টি আসে সাতশো বাহান্ন সঙ্গে নিয়ে
করমচা রঙের হাত, চিবুকের রেখা
চোখে চোখ
গোলাপ সৌরভ মেশা প্রতিটি নিশ্বাস, যত্ন করে
জমিয়ে রাখার মতো ;
সম্প্রতি ওল্টানো পদতলে
এত মায়া, বায়ু ধায় নশো উনপঞ্চাশের দিকে
নগ্ন প্রকৃতির
এত কাছাকাছি আর কখনো আসিনি মনে হয়
জীবন্ত কাঁটার কাছে হেরে যার গোপন ঈশ্বর
রূপের সহস্র ছবি, বা আনন্দ একটি শরীরে ?

সে কোথায় যাবে ?

পৌষের পূর্ণিমা রাত ডেকে বললো যা—
সে কোথায় যাবে ?
নিঝুম মাঠের মধ্যে সে এখন রাজা
একা একা দুন্দুভি বাজাবে ?

ছিল বটে রৌদ্রালোকে তারও রাজ্যপাট
সোনালি কৈশোরে
আজ উল্লুকের পাল হয়েছে স্বরাট
চৌরাস্তার মোড়ে।

দাঁতে দাঁত ঘষাঘষি, চোখের টঙ্কার
এরকম ভাষা
সে শেখেনি, তাই এই রূপকথায় তার
জন্ম কীর্তিনাশা !

গায়ে সে মেখেছে ধুলো, গূঢ় ছদ্মবেশে
বোবা ভ্রাম্যমাণ
অদৃশ্য সহস্র চোখ তবু নির্নিমেষে
ছিলা রাখে টান।

পৌষের পূর্ণিমা রাত ডেকে বললো, যা—
সে কোথায় যাবে ?
যেতে সে চায়নি ? কেউ খুলেছে দরোজা
পুনরায় মনুষ্য স্বভাবে ?

তমসার তীরে নগ্ন শরীরে

চিত্ত উতলা দশদিকে মেলা সহস্র চোখ
আমাকে এবার ফিরিয়ে নেবার জন্য এসেছে ?
আর দুটো দিন করুণ রঙিন
পথ ঘুরে দেখা
হবে না আমার ? পুরোনো জামার ছিঁড়েছে বোতাম ?

তমসার তীরে নগ্ন শরীরে
দাঁড়ালাম আমি
পাশে নেই আর মায়া সংসার আকাশে অশনি
নদীটি এখন বড় নির্জন
জলে শীত ছোঁওয়া

কে জানে কোথায় ন্যায় অন্যায় সহসা লুকালো !
এক অঞ্জলি জল তুলে বলি,
হে আঁধারবতী,
বহু ঘুরে ঘুরে স্বপ্নে সুদূরে দেখা হয়েছিল
দুঃখে ক্ষুধায় এই বসুধায়
হয়েছি হন্যে
কখনো দাওনি সুধার চাহনি ফিরিয়েছো মুখ !
মনে আছে সব ? শেষ উৎসব
আজ শুরু হবে
মেশাবো এ জলে মন্ত্রের ছলে অতি প্রতিশোধ
শরীর জানে না কে কার অচেনা
তাই ছুঁয়ে দেখা
এ অবগাহন শরীর-বাহন চির ভালোবাসা !

যে আমায়

যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি
যে আমায় ভুলে যায়, আমি তার ভুল
গোপন সিন্দুকে খুব যত্নে তুলে রাখি
পুকুরের মরা ঝাঁঝি হাতে নিয়ে বলি,
মনে আছে, জলের সংসার মনে আছে ?
যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি !

যে আমায় বলেছিল, একলা থেকো না
আমি তার একাকীর অরণ্যে খুঁজেছি
যে আমায় বলেছিল, অত্যাগসহন
আমি তার ত্যাগ নিয়ে বানিয়েছি শ্লোক
যে আমায় বলেছিল, পশুকে মেরো না
আমার পশুত্ব তাকে দিয়েছে পাহারা !
দিন গেছে, দিন যায় যমজ চিন্তায়
যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি !

স্বপ্নের কবিতা

আমি তো দাঁড়িয়ে ছিলাম পাশে, সামনে বিপুল জনস্রোত
হলুদ আলোর রাস্তা চলে গেছে অতিকায় সুবর্ণ শহরে
কেউ আসে কেউ যায়, কারুর আঙুল থেকে ঝরে পড়ে মধু
কেউ দাঁতে পিচ কাটে, সুবর্ণষ্ঠীবীর স্মৃতি লোভ করে
কেউ বা ছুঁয়েছে খুব লঘু যত্নে, সুখী বারবনিতার
তম্বুরা যুগল হেন পাছা
কারো চুলে রত্নচ্ছটা, কারো কণ্ঠে কাঁচা-গন্ধ বাঘনখ দোলে
আমি তো দাঁড়িয়ে ছিলাম পাশে, সামনে বিপুল জনস্রোত।

কোথায় সুবর্ণ সেই নগরীটি ? কোন্ রাস্তা হলুদ আলোয় আলোকিত ?
কে দাঁড়িয়ে ছিল সেই পথপ্রান্তে ? আমি নয়, কোনোদিন দেখিনি সে পথ
আঙুলে কী করে ঝরে মধু ? কেন কেউ কণ্ঠে রাখে কাঁচা বাঘনখ ?
কিছুই জানি না আমি, এমন কি সুবর্ণষ্ঠীবীর ঠিক বানানেও রয়েছে সন্দেহ
তবু কেন কবিতা লেখার আগে এই দৃশ্য, অবিকল, সম্পূর্ণ অটুট
স্বপ্ন, কিংবা তার চেয়ে বেশি সত্য হয়ে ওঠে, আমার চৈতন্যে বেঁধে সূঁচ
প্রায় কোনো কাটাকাটি না করেই অফিস-টেবিলে বসে আমি
ঐ দৃশ্য লিখে যাই।

জেনে গেছি

এমন মানুষ রোজই দেখি, যাঁরা আমায় আগে চিনতেন
ডেকে বলতেন
এই যে সুনীল, কেমন আছো, বসো, চা খাও
এখন তাঁরা মুখ ফিরিয়ে শুকনো হাস্য,
আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন
কালো গহ্বর।
বৃষ্টি হয়নি বিকেলবেলা, পোড়া গরম, আমারই দোষ ?
সে অপরাধে অনেকবার আমি হয়েছি মূল আসামী
ঘরে ঢুকলে অনেকে আজ জানলা দিয়ে বেরিয়ে যেতে
হুকুম করেন।

মধ্যরাতে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল ট্রেন। আমার ঘুম হলো না
পাগলা হাওয়ায় উড়িয়ে নিল নীল রুমাল, একটি তারা
পুড়তে পুড়তে
খসে পড়লো বনের মাথায়
সেটাও যেন আমারই দোষ, সেই থেকে আর কথা বলে না
একটি মেয়ে!

বয়স হলো তিরিশ পার, বাঁ জুলপিতে তিনটে সাদা শিকড়
আর দু'দশটা বছর বাঁচবো,
এখন আমার পোশাক বদলে
তৈরি হয়ে নেবার পালা
অনেক যত্নে ধুয়েছি হাত, জটলা মাথায় পড়লো
আবার চিরুনি
দাড়ি কামানো আদুরে মুখ, বেরিয়ে পড়বো ফুরফুরে এক বিকেলে
একলা একলা অনেক দূরে যেতে হবে,
গোপন কোনো নদীর তীরে
অনেক দিন তো কাটলো, এবার নিজের সঙ্গে দেখা হবে না?

হলুদ পাখিরা

ছিল আমার শূন্য খাঁচা, উড়তে উড়তে এলো একটা
হলুদ পাখি
খাঁচার উপর বসে খুশির ল্যাজ দোলালো
চোখ ঘোরালো
ছিল আমার শূন্য খাঁচা ছিটকিনি নেই, শুকনো বাটি
হলুদ পাখি তারই মধ্যে সুরুৎ করে ঢুকে পড়লো!

হলুদ রং যে অবিশ্বাসী সবাই জানে
পাতলা ঠোঁটে মধুর শিস সর্বনাশী
পালক ভরা আলোর খেলা দাঁড়ের ওপর
নাচের খেলা
কেন যে এই মোহিনী ভ্রম শূন্য খাঁচায় ঢুকে পড়লো!

আকাশ ভরা শূন্যতার প্রান্তে একটা শূন্য খাঁচা
হলুদ পাখি দিগন্তের শূন্য থেকে উড়তে উড়তে
বাসা বাঁধলো খাঁচার শূন্যে
ফাঁকা দেখলেই ভরে ফেলবে এই মানসে
দাঁড়ের ওপর ল্যাজ ঝুলিয়ে খুনসুটিতে চোখ মারবে
পাখা ঝাপটে গোপনতার আভাস দেবে
বলবে এবার খাঁচায় একটা আলগা মতন
ছিটকিনি দাও !

আমার গোপন

একটা ভীষণ গোপন কথা
খাঁচার মধ্যে বন্দী আছে
গোপন সে তো খুবই আপন
তবু এমন ছটফটানি
যেন সকাল থেকে সন্ধে
সারা বিশ্ব থমকে থেকে
আমার ক্ষুদ্র গোপনতার
নিশান দেখে সুনাম গাইবে ।

আমার গোপন ক্ষুদ্র ছিল
যখন তার জন্ম হয়নি
ক্রমশ তার চক্ষু ফোটে
ডানায় কাটে স্নিগ্ধ বাতাস
খাঁচায় আর ধরা যায় না
রঙিন জামার মধ্যে লুকোয়
শরীর দিয়ে খোঁজাখুঁজির
শেষেও তার শেষ মেলে না
আমার গোপন রাত্রিকালের
জ্যোৎস্না হয়ে লুটিয়ে থাকে ।

জল বাড়ছে

কেউ জানে না, গোপনে গোপনে জল বেড়ে উঠছে
জল বাড়ছে, তিস্তায়, জল বাড়ছে তোর্সা,
রাইডাক, কালজানি নদীতে
জল বাড়ছে, জল বাড়ছে, শুকনো নদীগুলো
এখন উন্মাদিনী
নেমে আসছে পাহাড়ী ঢল, ভেসে যাচ্ছে ফসলের ক্ষেত,
ভেঙে পড়ছে চা-বাগান
ডুবছে গ্রাম, চুয়াপাড়া, হাসিমারা, বাক্‌সাদুয়ার
জল বাড়ছে মহানন্দার, জল বাড়ছে পুনর্ভবা,
নাগর এবং কালিন্দীতে
ক্রুদ্ধ বিদ্রোহী জল ফুঁসে ফুঁসে উঠছে
ঝাপটা মারছে হাতে হাত মিলিয়ে
ভেঙে পড়ছে ভালুকা, রতুয়া, বলরামপুর, ইংলিশবাজার
ঘুমন্ত গ্রামগুলির ওপর দিয়ে হুড় হুড় করে
এগিয়ে আসছে জলস্রোত
জল বাড়ছে অজয়, মুণ্ডেশ্বরী, কেলেঘাই নদীতে
জল বাড়ছে গঙ্গায়, পদ্মায়, যমুনায়, দামোদরে
জল বাড়ছে, জল বাড়ছে
রোগা জল, কালো জল, দুঃখী জল, ভীতু জল
বুকের পাঁজরার মতো, তানপুরায় টংকারের মতো,
উড়ন্ত রুমালের মতো
জলের চঞ্চল খেলা
শত শত ভ্রমরীর সহসা দিগন্তে উড়ে যাওয়া
অন্তরীক্ষ জুড়ে একটা ঘোর শব্দ—যা সংগীত নয়
ফরাক্কা ডি ভি সি'র বাঁধে প্রবল ধাক্কা দিচ্ছে জল
যেন লক্ষ লক্ষ বাহু—
এবার সব ভেঙে পড়বে
জল উপচে এসেছে বর্ধমান, আসানসোল, দুর্গাপুরে
শোনা যাচ্ছে সম্মিলিত গর্জন
ওরা আর পিছিয়ে যাবে না
জল বাড়ছে, জল বাড়ছে
সমস্ত ঘুম ভেঙে দেবে এবার

জল গড়িয়ে এসেছে কলকাতার ময়দানে
চতুর্দিক থেকে শহরকে ঘিরে দৌড়ে আসছে ওরা
লাল, নীল, সবুজ বিভিন্ন রঙের
পতাকা ওড়ানো অফিসে দুমদাম করে
ধাক্কা দিচ্ছে জল

জল বাড়ছে, জল বাড়ছে
এইমাত্র তারা ঢুকে এলো অফিসপাড়ায়
বিনয় বাদল দীনেশের মতো দুর্দান্ত সাহসী জল
লাফিয়ে উঠে পড়লো রাইটার্স বিল্ডিংস-এর বারান্দায়…

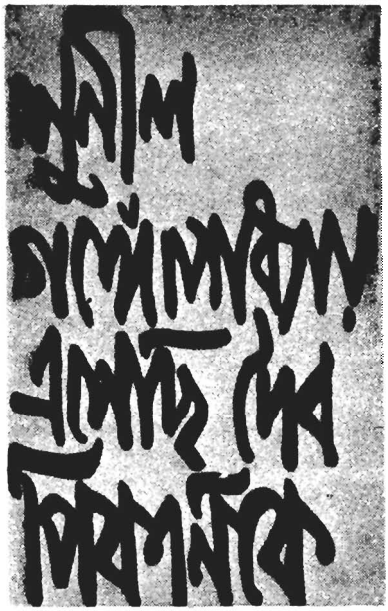

এসেছি দৈব পিকনিকে

সূচিপত্র

মানুষের মুখ চিনে ৯১, খেয়াঘাটে ৯১, এই দৃশ্য ৯২, এখন আমি ৯৩, বকুল গাছের নীচে ৯৪, শিল্প প্রদর্শনীতে ৯৪, লাইব্রেরীর মধ্যে ৯৫, চায়ের দোকানে ৯৬, ফুল ৯৬, এক জীবন ৯৭, রেলের কামরায় পিঁপড়ে ৯৮, কেঁদুলির যাত্রী ৯৮, সুধা, মনে আছে ? ৯৯, এ কার উদ্যান ? ১০০, কালো অক্ষরে ১০০, রূপনারানের কূলে ১০১, কে তুমি ১০২, দেখিনি বহু দিন ১০২, নীরার কাছে ১০৪, কেউ শুধালো না ১০৪, মানুষ যতটা বড় ১০৫, শব্দ আমার ১০৬, ধলভূমগড়ে আবার ১০৬, এই সময় ১০৭, ফেরা না ফেরা ১০৭, কথা ছিল ১০৮, খেলাচ্ছলে ১০৮, মায়া সুন্দর ১০৯, বাসের ভিতরে ১১০, প্রত্যাখ্যান ১১০, প্রতিহিংসা ১১১, জলের কিনারে ১১২, মুখ দেখিনি ১১২, এখানে কেউ নেই ১২২, একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল…১১৩, এই জীবন ১১৪, আমাকে জড়িয়ে ১১৪, আত্মদর্শন ১১৫, অবেলায় প্রেম ১১৬, দেখা হবে ১১৬, ভালোবাসা ১১৭, তুমি আমি ১১৭, প্রাণের প্রহরী ১১৮

মানুষের মুখ চিনে

শুয়োরের বাচ্চারাই সভ্যতার নামে জিতে গেল
ওদের নিজস্ব রাস্তা, ওরাই দৌড়োবে
ওদেরই মুখোশ নিয়ে দেশে দেশে চলে যায় অবিমিশ্র দূত
বিমানের সিঁড়ি থেকে পা পিছলে কোনোদিন
একজনও পড়ে না।
বাঁধানো দাঁতের হাস্যে সভ্যতার নাম রটে খুব।

শুয়োরের বাচ্চাদের কৌতুক কাহিনী নিয়ে
ভরে যায় মহাফেজখানা
ওরাই নদীতে বাঁধে সেতু, ফের দু' একবার
বিছানায় পাশ ফিরে ওদেরই নিজস্ব অস্ত্রে
টুকরো হয়ে ছিটকে যায় কংক্রীট মিনার!
অন্যদিকে রক্তের নদীতে ভাসে সুদৃশ্য তরণী
সেখানে সঙ্গীত-সুরা, কঙ্কালের সঙ্গে পাশা
খেলে পুরোহিত
শুয়োরের বাচ্চাদের এই সভ্যতার গায় হিসি করে দাও!

তুমি আমি ফিরে যাবো, আমরা অসভ্য রয়ে যাবো
এখনো অরণ্য আছে, হিম আকাশের নীচে এখনো কোথাও
পরাগ-সৌরভ ভাসে, শিস দেয় রাত-চরা পাখি
লুকোনো ঝর্নার পাশে আমরা উলঙ্গ হবো, মায়াবী জ্যোৎস্নায়
মানুষের মুখ চিনে মানবিক নাচের উৎসব শুরু হবে।

খেয়াঘাটে

ডোরাকাটা সোয়েটারের মতো চামড়া
একটি কুকুর ছুটে গেল
কোনাকুনি পশ্চিমের দিকে
তখন বৃষ্টির ঠিক আগের মুহূর্ত
তীব্র নাদে কাঁপিয়ে ভল্লুক বর্ণ মেঘ
একটি রুপালি বর্শা

সোজা এসে গেঁথে গেল
নদীর পাঁজরে
পিত্তল বাসন নিয়ে সিক্ত এক নারী
চলে গেল শাড়ী সপসপিয়ে
ঈষৎ পৃথুলা, তবু কোমরে জাদুর ছোঁয়া
বাঁক ঘুরবার আগে তাকে ছুঁয়ে ছেনে গেল
চৈত্রের বাতাস
তিনটি ধবল হাঁস সেধে নিল গলা···

খেয়াঘাটে এসময় আর কেউ নেই, আমি একা—
আমি কি যাবো না ? আমি পিছনে দৌড়োবো ?
যতই চিৎকার করি, বজ্রপাত ছাড়া কোনো
প্রত্যুত্তর নেই
কালো হয়ে আসে বেলা, আমি সুচ রাজা হয়ে
ভূমিতে শয়ান।

এই দৃশ্য

হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
নীল ডুরে শাড়ী, স্বপ্নে পিঠের ওপরে চুল খোলা
বাতাসে অসংখ্য প্রজাপতি কিংবা সবই অভ্রফুল ?
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
চোখ দুটি বিখ্যাত সুদূর, পায়ের আঙুলে লাল আভা।
ডান হাতে, তর্জনীতে সামান্য কালির দাগ
একটু আগেই লিখছিলে
বাতাসে সুগন্ধ, কোথা যেন শুরু হলো সন্ধ্যারতি
অন্যদেশ থেকে আসে রাত্রি, আজ কিছু দেরি হবে
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
শিল্পের শিরায় আসে উত্তেজনা, শিল্পের দু'চোখে
পোড়ে বাজি

মোহময় মিথ্যেগুলি চঞ্চল দৃষ্টির মতো, জোনাকির মতো উড়ে যায়
কোনোদিন দুঃখ ছিল, সেই কথা মনেও পড়ে না

হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
সময় থামে না, জানি, একদিন তুমি আমি সময়ে জড়াবো
সময় থামে না, একদিন মৃত্যু এসে নিয়ে যাবে
অতৃপ্ত বাসনা, ছোট ছোট সুখ, চলে যাবে
দিগন্ত পেরিয়ে
নতুন মানুষ এসে গড়ে দেবে নতুন সমাজ
নতুন বাতাস এসে মুছে দেবে পুরোনো নিশ্বাস,
তবু আজ
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
এই বসে থাকা, এই পিঠের ওপরে খোলা চুল,
আঙুলে কালির দাগ
এই দৃশ্য চিরকাল, এর সঙ্গে অমরতা সখ্য করে নেবে
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো…

এখন আমি

হাতের মুঠোয় ছিলএকটা মস্তবড় নদী
নদীর মধ্যে ছিল আমার বাল্যকালের ভয়
ভয়ের পাশে সরলতার বাগান আর প্রাসাদ
হারিয়ে গেল,
সমস্তই হারিয়ে গেল !
নদীও নেই, ভয়ও নেই, কোথায় সেই
কাননঘেরা বাড়ি ?
এখন আমি মানুষ, আমি কঠিন একটি মানুষ !

বকুল গাছের নীচে

বকুলগাছের নীচে অকস্মাৎ নেমেছিল প্রেত
বড় দুঃখী, একা, ছন্নছাড়া !
দিগন্তকে একদিন ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়িয়েছে যারা
তারা নেই, সবাই প্রবাসী
আজ শুধু শোনা যায় দূর প্রান্তে শীতের সঙ্কেত
ভুল হয় যেন কার বাঁশী
রাতের বকুল ঝরে, জ্যোৎস্না ভ্রমে ডেকে ওঠে কাক
ওখানে কি ছায়া, না ইশারা ?
যারা ভালোবেসেছিল আজ সকলেরই বুক পুড়ে খাক
তবু শোনা যায় কার হাসি ?
বকুল গাছের নীচে একদিন নেমেছিল প্রেত
বড় দুঃখী, একা ছন্নছাড়া— ।

শিল্প প্রদর্শনীতে

একটি বিমূর্ত মূর্তি, পাথরের, সুবৃহৎ চৌকো চোখ
গালে যেন পচা মাংস, অদ্ভুত বীভৎস ওষ্ঠাধর
শিল্পী এরকম গড়েছেন
আর ঠিক তারর সামনে শাড়ী-মোড়া জীবন্ত সুন্দর ।

টেবিলের পাশ থেকে শিল্পীটি এগিয়ে এসে
স্মিত হাসলেন
তৃতীয় ব্যক্তির দৌত্যে পরিচয় সাঙ্গ হলো চোখে চোখ রেখে
রমণীর বাঁ স্তনের ওপরে ব্যাগের স্ট্র্যাপ,
কটিতটে নদীর জোয়ার
আঁচলে সুগন্ধ, চিবুকের মসৃণতা রেশমের ঈর্ষা আনে
এইসব নারীদের অপর পুরুষে নিয়ে যায় ।

দু'একটি কথার পর পুনরায় দ্রষ্টব্যের দিকে মনোযোগ
'দারুণ' এ হেন শব্দে প্রশংসা ছটফট করে
'সভ্যতার খাঁটি রূপ শিল্পীর বলিষ্ঠ হাতে

যেরকম জীবন্ত হয়েছে…'
'বিশেষত চোখে ঐ যে অসহায় আর্তনাদ'
বিনয়ে শিল্পীর ঘাড় নিচু, মুখখানি দুঃখী দুঃখী
কেন দীর্ঘশ্বাস পড়ে এ সময় ?
নারীর ভুরুতে দুটি মুক্তাবিন্দুসম ঘাম
এইমাত্র মুছেছে রুমাল
যেন দেবদূতী তার বিস্ময়ের উপহার দিয়েছে দ্রষ্টাকে
'চলুন চা খাওয়া যাক', এই বলে এর পরে
সকলেই ক্যান্টিনের দিকে…

লাইব্রেরীর মধ্যে

লাইব্রেরীর মধ্যে এক মৃত্যু
অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে শুয়ে আছে
এত মৃত মনীষার মাঝখানে ঐ এক ছড়ানো শরীর
এখনো উত্তপ্ত, ঠোঁটে কফির বাদামী স্বাদ
আঙুলে দীর্ঘায়ু আংটি
নোখে কিছু ধুলো
ঐ হাত ছুঁয়েছিল বহু শতাব্দীর ইতিহাস
এখন নশ্বর হয়ে পড়ে আছে, এখন কিছু না !

সব শেষ হয়ে গেলে নিস্তব্ধতা জানালায় বসে…
রোদ্দুর গুটিয়ে যায়, ডানা মেলে আসে দীর্ঘ যাম
পঞ্চম ভল্যুম থেকে সে সময়
দেকার্তকে ডেকে বলে তৃতীয় চার্বাক
ছিঁড়ে ফেলো সব তত্ত্ব,
এই ছোকরা দেখিয়ে দিলো হে
ইচ্ছামৃত্যু কতখানি
মাথা উঁচু করে চলে যায় !
দক্ষিণের শেলফে বসে নীৎসের সমর্থন, ঠিক, ঠিক, ঠিক ।

চায়ের দোকানে

এইটুকুনি শহর তার দু'দিকে ট্রেন লাইন
মাথার ওপর আকাশ আর যেদিকে যাও আকাশ
নক্সা কাটা রেল কলোনি, খানিক দূরে বাজার
তার ভিতরে চায়ের দোকান, তার ভিতরে
কবির দলের টেবিল।

উনিশ থেকে তেইশ কিংবা খানিক এদিক-ওদিক
সেদিন যারা কিশোর ছিল এখন সদ্য যুবক
বোতাম খোলা শার্টের নীচে হাতে-গরম হৃদয়
ওষ্ঠে গালে নতুন রোম, যখন তখন
চিরকালের হাসি।

তিনটি চা, সাতটি কাপে, দুই সিগারেট ছ'জন
কথায় কথায় তুফান ওঠে, রৌদ্র-ঘড়ি স্থির
রুক্ষ চুল, জ্বলজ্বলে চোখ, কণ্ঠভরা দাপট
এই টেবিলটি এক দুনিয়া, এই টেবিলে
অন্যরকম জীবন।

এইটুকুনি শহর, সেটা যখন তখন ফুরোয়
চেনা মানুষ, ভেজাল কথা, জন্ম-মৃত্যু-মিলন
সব কিছুই তো মাপ মতন, রৌদ্র বৃষ্টি-শীতও
শুধু চায়ের দোকানটিতে কয়েকজন
ছদ্মবেশী রাখাল!

ফুল

গাছ তার ঝরে পড়া ফুলগুলি নিয়ে কিছু ভাবে?
ঘাসের ওপরে ফুল, তখনো শিশির ভেজা
ছুঁয়ে যায় বালিকার হাত
ভোরের বাতাস কিছু স্নেহ করে
তপন তখন সংবরণ করে তেজ

ফুলগুলি চলে যাবে, গাছ কিছু ভাবে ?

ফুলের ভিতরে নেই বিষ, তাই
সুন্দরের প্রসিদ্ধি পেয়েছে
শিমুল, জারুল, শাল এ রকম লম্বা চওড়া গাছও
এমন কোমল ফুলে ছেয়ে থাকে কেন ?
এ কি মায়া ? এ কি স্বপ্ন ?
এ কি শুধু ঝরাবার খেলা ?

তারপরই ঘোর ভাঙে
সুন্দরের পাশে এসে প্রহরীর মতো
দাঁড়ায় নিখিল প্রয়োজন
সব কিছু ঠিকঠাক চলে
আমিই বা কেন এত ফুল নিয়ে মাথা মুণ্ডু ভাবি !

এক জীবন

শামুকের মতো আমি ঘরবাড়ি পিঠে নিয়ে ঘুরি
এই দুনিয়ায় আমি পেয়ে গেছি অনন্ত আশ্রয়
এই রৌদ্র বৃষ্টি, এই শতদল বৃক্ষের সংসার
অস্থায়ী উনুন, খুদ কুঁড়ো—
আবার বাতাসে ওড়ে ছাই
আমি চলে যাই দূরে, আমি তো যাবোই,
জন্ম মৃত্যু ছাড়া আর আমি কোনো সীমানা মেনেছি ?

এ আকাশ আমারই নিজস্ব
আমারই ইচ্ছেয় হয় তুঁতে
নারী ও নদীরা সব আমারই নিলয়ে এসে
পা ছড়িয়ে স্মৃতিকথা বলে
চমৎকার গোপন আরামে কাটে দিন
আর সব রাত্রিগুলি নিশীথ কুসুম হয়ে ঝরে যায়…

রেলের কামরায় পিঁপড়ে

এ পৃথিবী চেয়েছে চোখের জল, পায়নিও কম
যেটুকু দেবার দিয়ে যে-যার নিজের পথে চলে যায়
মাঝে মাঝে এমন উদাস করা আলো আসে
অনেকে দেখে না, কেউ দেখে
তখন সে কার ভাই, বন্ধু ? কার আর্যপুত্র ? সে কারুর নয়
বড় মায়া, বুক ছেঁড়া দীর্ঘশ্বাস, আবাল্যের এত স্নেহ ঋণ
বিষণ্ণতা পায়ে হেঁটে চলে যায় সূর্যাস্তের দিগন্ত কিনারে
রেলের কামরায় পিঁপড়ে যে-রকম যায় দেশান্তরে।

কেঁদুলির যাত্রী

সেই অন্ধকার পথ ভেঙে যাওয়া, অজস্র জোনাকি, বুকের
উষ্ণতা কাড়ে হাওয়া, তবু শ্রবণ উৎকর্ণ, আরো দূরে, অথচ
তেমন দূরে নয়, আঁধার নির্মাণ থেকে উঠে আসে অঙ্গহীন
রথ, অদেখা নদীর কাছে খেলা করে স্বর্গের সৌরভ···
পায়ে পায়ে যাওয়া, শুধু যাওয়া, খুব বেশি দূরে নয়, অথচ
পথের শেষ বাঁকে, ভাষাহীন বন্ধুদল, চকিতে ঝিলিক দেয়
নিজস্ব আগুন, ক্রমশই গাঢ় হয়ে আসে শীত, র‍্যাপার লুটিয়ে
পড়ে গৈরিক ধুলোয়, অকস্মাৎ জেগে ওঠে পাখির কান্নার মতো
গান···
এখানে ওখানে আলো, কালো ছায়া, অসংখ্য অদৃশ্য হাত
হাতছানি দিয়ে ওঠে, এবার বাতাস কেটে ছুটোছুটি, দোকানে
বিনিদ্র মাছি এবং চিনির গন্ধ পাশে রেখে চলে যাই, ভিজে
ঘাসে ধুপ করে বসে পড়ি, বালক বাউল রাখে আকাশের
দিকে চোখ, সুর যায় দিগন্ত পেরিয়ে।

সুধা, মনে আছে ?

তিনজন অমলকে চিনি তারা কেউ ডাকঘরের নয়
দুজনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অন্যজন এখন বিদেশে
প্রবাসী অমল বেশ স্বাস্থ্যবান, যেমন দরাজ বক্ষ,
তেমনি বিশাল সুখী, মদ্যপানে খুব নামডাক
আরেকজন টালিগঞ্জ থেকে রোজ শিয়ালদায় এসে
ঘড়ির দোকানে বসে
ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ঘোরে।
অপরটি জাঁহাবাজ শব্দ সওদাগর
আমাকেও মাঝে মাঝে বুঝিয়েছে জীবনের মানে
তার স্ত্রীকে দুপুরে একলা দেখি পার্ক স্ট্রীটে
সে কথা বলি না।
তিনজন অমলকে চিনি, তারা কেউ ডাকঘরের নয়।

রূপালি পর্দার মতো বৃষ্টি ওড়ে, ভোরবেলা ভেঙে যায় ঘুম
বাড়ির সামনে রাস্তা, এত চেনা, তবু যেন মনে হয়
চলে গেছে অনন্ত সন্ধানে
গাছগুলি বাউলের মতো হাত বাড়িয়েছে
আকাশের দিকে
ফিরিওয়ালা আজ এক অন্য সুরে গান গেয়ে গেল
আমার চমক লাগে
একলক্ষ রোমে শিহরন
জানলার গরাদ ধরে দাঁড়াতেই টের পাই,
আমি বন্দী
যা কিছু কাজের ছিল, সকলই অচেনা
তখন হঠাৎ সেই তিনজন অমল এসে
একসঙ্গে, কাতর গলায় প্রশ্ন করে,
সুধাও কি ভুলেছে আমাকে ?

এ কার উদ্যান ?

এ কার উদ্যান ? কে এত সযত্নে সাজিয়েছে
ফুলের কেয়ারি
সবুজ ঘাসের পাশে গোলাপ দুর্দান্ত লাল,
এবং মাধবী
কিশোরী মেয়ের মতো সদ্য যৌবনের দিকে
হাত বাড়িয়েছে।
শিউলি ফুলের রাশি ঝরে আছে শৈশবের স্মৃতি
বিভিন্ন সুগন্ধ যেন ঝড় হয়ে ছুটে আসে ঘ্রাণে—
এ কার উদ্যান ?
এই পর্টুলেকা, এই যূথী সমারোহ ?

এ আমারই।
রেলিং-এর পাশে আমি দীন ভিখারীর মতো
দাঁড়িয়ে রয়েছি
আমার এ পৃথিবীতে এক টুকরো ভূমিখণ্ড নেই।
তবু এই কুসুমের এমন উৎসব সাজ,
সৌরভের এই বন্যা—
সকলই আমার
ক্ষুধার্তের মতো আমি এই রূপ শুষে নিই চুষে চুষে খাই !

কালো অক্ষরে

কালো অক্ষরে থেকেছি মগ্ন সারাদিন সারা মাস ও
বছর
চোখ ক্ষয়ে গেল, বুক জ্বলে গেল, জুলপি ও চুলে
সাদা সাদা ছোপ
বাইরে আকাশ, বাইরে মধুর, বাইরে নারীরা
এই যে আয়ুর হনন এই যে দিন দিনান্ত হৃদয়ে প্রবাস
এই যে পরের দুঃখ ও সুখ, যে যার খেলায়
রয়েছে মত্ত
কার নিশ্বাস কার চাপা হাসি চকিতে তাকাই

সকলই অলীক
শুধু কাছে থেকে কালো অক্ষর, সারাদিন সারা মাস ও
বছর
কালো অক্ষর কালো শৃঙ্খলা এক জীবনের ভ্রান্তি বিলাস
চোখ ক্ষয়ে গেল, বুক জ্বলে গেল, আয়ুর হনন,
হৃদয়ে প্রবাস।

রূপনারানের কূলে

রূপনারানের কূলে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম
পৃথিবীতে নতুন চাঁদ উঠেছিল সেদিন,
অজানা ধাতুর মতন আভা
তার নীচে মধুলোভীদের দুরন্ত হুটোপুটি
নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে অসংখ্য সিল্কের ওড়না
পাগল গলার গান দিগন্তকে কাছে নিয়ে আসে
নারীদের কারুর পা এই ধুলোমাটির পৃথিবী ছোঁয় না।
যেন আমরা এসেছি দৈব পিকনিকে
নতুন চাঁদের নীচে সেই এক নতুন রাত্রি
সেই পূর্ণকে শূন্য করার প্রতিযোগিতা, গোপন চুম্বন—
আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে ছড়িয়ে যায় বিদ্যুৎ,
গোল স্তনগুলিতে আগুনের হল্‌কা
কৌতুক হাস্যে ভাঙে বিশেষ তরঙ্গ, যা আগে কেউ জানেনি!
বাতাসের সুগন্ধ আমাকে অনুসরণ করিয়ে নিয়ে যায়
সকলের থেকে খানিকটা দূরে
নদীর কিনারে বসে, অকস্মাৎ একা হয়ে, মনে পড়ে
এই খেলা ভেঙে যাবে!
অথচ জীবন এরকম সুস্বপ্ন হবার কথা ছিল
অথচ জীবন কেন এই স্বপ্ন থেকে নির্বাসিত?
তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি এক হাত জলে ডুবিয়ে
নদীকে সাক্ষী রেখে ঘুমিয়ে পড়ি।
আমাকে জাগিও না!

কে তুমি

—কে তুমি ? আড়াল থেকে সামনে এসো ।
—কোথায় আড়াল ? এ প্রকাশ্য দিবালোকে
সামনে এসেছি ।
—তবুও চোখের সামনে যেন একটা মসলিনের পর্দা,
রৌদ্রে আরও ধাঁধা লাগে,
কে তুমি ? কে তুমি ?
—দ্যাখো, আরো একটু সামনে এসেছি,
এখনো চিনলে না ?
—খানিকটা চেনা, চেনা এখনো অস্পষ্ট মুখ
ঐ হাসি কোথায় দেখেছি ?
ঐ চিবুকের রেখা, ঐ চোখ কার ?
—তুমি বহুদূর চলে গিয়েছিলে
আমার কথা কি আর মনেও পড়েনি ?
—জীবন জটিল এত, কত মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছি
কী করে সকলকে মনে রাখি ?
—এক সময় ভালোবাসা ছিল, কথা ছিল
আজন্ম দু'জনে দেখা হবে
সব ভুলে গেলে ?
—কে তুমি, হেঁয়ালি ছেড়ে পরিচয় দাও ।
—আমিই হেঁয়ালি তোমার জীবন সঙ্গী, কৈশোরের স্বপ্ন
মনে নেই ?
আমাকে পেছনে ফেলে তুমি কোন্ কর্কশ জগতে
চলে গেলে ?

দেখিনি বহু দিন

ছেঁড়া জামা, রুক্ষ চুল, জুতোয় পেরেক—
সে ছেলেটা কোথায় যে গেল !
পকেটে চকমকি ভরা, দুপুরে বা মধ্যরাত্রে মেধার ভ্রমণ
পায়ের তলায় সর্ষে, সর্বক্ষণ খিদে—
চতুর্দিকে সার্থকতা উদ্যানের বাথরুম হয়েছে

বস্তি ভেঙে গড়া হলো অন্তিম যাত্রার কত রাস্তা
অফিস ফেরার পথে অনেকেই সেইখানে
নিজের জুতোর শব্দে মুগ্ধ হয়ে গেছে—
এরকম সুন্দরের মধ্যে সেই অভুক্ত যৌবন
দু'হাত ছড়িয়ে তবু ঘোষণা করেছে,
আমি আছি।
কোথায় যে গেল সেই ছেলেটা, কোথায় যে গেল সেই
কোথায় যে গেল সেই ছেলেটা, দেখিনি বহুদিন !

সে বড় লাজুক, খুব অভীষ্ট বাড়িতে গিয়ে
বলেনি একটিও ছোট কথা
সিঁড়ির উপরে স্থির সাদা ফ্রক পরা রাজহংসীটিকে দেখে
কেঁপেছিল তার বুক বহুবার কেঁপেছিল বুক
তবু মুখ, তবু মুখ, তবু মুখ বন্ধ ছিল
সব কথা আগুনের ফুলকি হয়ে সহস্র চিঠির সঙ্গে উড়ে যায়
দুঃখ শিহরন মেশা কবিতায় ছোট ছোট মাসিকপত্রের কোণে
শুয়ে থাকে
এবং গোপন থেকে বেড়ে ওঠে তুলোর কৌটায় রাখা বীজ
যার থেকে জন্ম নেবে বৃক্ষ
যার কোনো ফুল কিংবা ফল আছে কিনা
কেউ তা জানে না !
আবার কখনো শুরু হয় অসময়ে অসি খেলা
পর পর লুটেরা, পুলিশ, ঠক—এইসব কঠিন দেয়াল
ক্রমশ এগিয়ে আসে, ক্রমশ এগিয়ে আসে মাথা লক্ষ্য করে
সে একা, বা দু'জন বন্ধুকে নিয়ে লড়ে গেছে জীবন সর্বস্ব
আকাশ ফাটানো কণ্ঠে মধ্যরাতে চেঁচিয়ে বলেছে,
আমি আছি !
অপবিত্র অর্ধাংশকে যে নেবে সে নিক
অপর পবিত্র অংশে এ জীবন পৃথিবীতে
দু'পা গেড়ে দাঁড়াবার
স্থান ছাড়বে না !
সীমানা ভাঙার রোখে রাত্রি ছিঁড়ে চেঁচিয়ে বলেছে,
আমি আছি !

কোথায় যে গেল সেই ছেলেটা, কোথায় যে গেল সেই
কোথায় যে গেল সেই ছেলেটা, দেখিনি বহুদিন !

নীরার কাছে

যেই দরজা খুললে আমি জন্তু থেকে মানুষ হলাম
শরীর ভরে ঘূর্ণি খেললো লম্বা একটা হলদে রঙের আনন্দ
না খুলতেও পারতে তুমি, বলতে পারতে এখন বড় অসময়
সেই না-বলার দয়ায় হলো স্বর্ণ দিন, পুষ্পবৃষ্টি
ঝরে পড়লো বাসনায় ।

এখন তুমি অসম্ভব দূরে থাকো, দূরত্বকে সুদূর করো
নীরা, তোমার মনে পড়ে না স্বর্গ নদীর পারের দৃশ্য ?
যূথীর মালা গলায় পরে বাতাস ওড়ে একলা একলা দুপুরবেলা
পথের যত হা-ঘরে আর ঘেয়ো কুকুর তারাই এখন আমার সঙ্গী ।

বুকের ওপর রাখবো এই তৃষিত মুখ, উষ্ণ শ্বাস হৃদয় ছোঁবে
এই সাধারণ সাধটুকু কি শৌখিনতা, ক্ষুধার্তের ভাতরুটি নয় ?
না পেলে সে অখাদ্য কুখাদ্য খাবে, খেয়ার ঘাটে কপাল কুটবে
মনে পড়ে না মধ্যরাতে দৈত্যসাজে দরজা ভেঙে কে এসেছিলো ?
ভুলে যাওয়ার ভেতর থেকে যেন একটি অতসী রং হল্‌কা এলো
যেই দরজা খুললে আমি জন্তু থেকে মানুষ হলাম ।

কেউ শুধালো না

মাথায় একটা ডাণ্ডা, একটা বুনো শব্দ, শেষ !
লোকটা মরে পড়ে রইলো,
লোকটা মরে পড়ে রইলো শিশির ভেজা মাঠে !

লোকটা কোনো শিশুর গালে
দেয়নি বুঝি টোকা ?

ঘোমটা-পরা নারীর হাত মুঠোয় ধরে
পার হয়নি মাঠের রেল লাইন ?
ঘাম-জড়ানো বুকের মধ্যে ছোয়ঁনি কোনো কান্না ?
এই লোকটি মাটিকে ভালোবাসেনি ?
এই লোকটি ধানের গন্ধ নেয়নি ?
এই লোকটি শীতের রাতে নিজের গায়ের কাঁথা
দেয়নি অন্যকে ?
এসব কেউ শুধালো না
যাবার পথে একবারও কেউ ফিরেও তাকালো না
লোকটা মরে পড়ে রইলো
লোকটা মরে পড়ে রইলো শিশির ভেজা মাঠে ।

মানুষ যতটা বড়

মানুষ যতটা বড় হতে চেয়েছিল
তার চেয়ে নিজেই সে বড়
পাহাড়ের কাছে গিয়ে মানুষ প্রথমে নত
করেছিল মাথা
তারপর পাহাড় শিখরে উঠে
কালপুরুষের দিকে দিল হাতছানি !
মানুষ লিখেছে এই সমুদ্রের
সহস্র বন্দনা
অসীম পদবী দিয়ে দেখিয়েছে
মহৎ সম্মান
তারপর তুড়ি মেরে সমুদ্রকে করে গেছে
এ ফোঁড় ও ফোঁড়
নিজেই অসীম হয়ে জলধিকে স্তম্ভিত করেছে !
মানুষ যতটা বড় হতে চেয়েছিল
তার চেয়ে নিজেই সে বড় ।

শব্দ আমার

শব্দকে তার বাগানটি দাও, শব্দ একলা বন্দী ঘরে
যেমন ছিল বাগান সেই নদীর ধারে পোড়ো বাড়ির
যেমন ছিল পায়ের তলায় সর্ষে, শিশুর খেলনা গাড়ি !
এই বিকেলের সিংহ-মার্কা খাঁটি আলোয় ইচ্ছে করে
ভালোবাসার গায়ে লাগুক খ্যাপার মতন ঝোড়ো বাতাস—
টুকরো-টাকরা কাগজপত্র, মলিন ঘর, ছেঁড়া আঁধার
অনিশ্চিত চিঠির বাক্স, সাত মাইলের গণ্ডি বাঁধা
এসব থেকে বেরিয়ে আসুক একটা হল্‌কা। সারা আকাশ
দু' ভাগ চিরে একটি অংশ চোরাবাজারে যে-খুশি নিক !
আরেক দিকে বাগান, সব ছেলেবেলার স্বপ্নে ফেরা
শিমুল তুলোর ওড়াওড়ি, দিক-ভোলানো দিঙনাগেরা
শব্দ আমার জীবন, আমার এক জীবনের পরম ক্ষণিক !

ধলভূমগড়ে আবার

ধমভূমগড়ে আবার ফিরে গেলাম, যেন এক সৃষ্টিছাড়া
লোভে। ওরা আর কেউ নেই। তরুণ শালবৃক্ষটি, যাঁর
মূলে হিসি করেছিলাম, তিনি এখন পরিবার-প্রধান
হয়েছেন। তাঁর চামড়ায় আর তকতকে সবুজ আঁচ দেখা
যায় না। কাঁটা গাছের ঝাড়ে ঐ থোকা থোকা সাদা
ফুলগুলোর নাম কী, জানা হলো না এবারও, ফুলমণি নামে
যে মেয়েটি আমার ওষ্ঠ কামড়ে রক্তদর্শন করেছিল, সে
ডুবে মরেছে দূরের সুবর্ণরেখায়। সেই নদীর শিয়রে এই
শেষ বিকেলে সূর্যের ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে এখন। পাঁচটি
বিশাল বর্শা বিঁধে আছে আকাশের উরুতে, যেন এই
মুহূর্তে এক দুর্ধর্ষ খেলা সাঙ্গ হলো। মহুয়ার দোকানটির
কোমরে ঐ সিমেন্টের বেদি না-থাকা ছিল ভালো।
ঐখানে এক উন্মাদিনী নর্তকী দেখিয়েছিল তার তেজী
স্তনের কাঁপন, তার নিতম্বের গোঠে ঝামরে উঠেছিল
অন্ধকার। শালিকের মতন সে চলে যাবার পরও শব্দটা
রেখে গেছে। মাতালের অট্টহাসি থামিয়ে দেয় ট্রেনের

হুইশ্ল।
জঙ্গলের মধ্যে তিনশো পা স্তব্ধভাবে হেঁটে গিয়ে এক
শুকনো খাঁড়ির পাশে আমরা তিন বন্ধু হাঁটু গেড়ে বসি।
পুরোনো সৈনিকদের ফিরে আসার কথা ছিল, সর্বাঙ্গ
ক্ষতবিক্ষত, তবু আমরা এসেছি। চিনতে পারো ?

এই সময়

দুঃখ চেয়েছি, তা বলে এতটা দুঃখিত হয়ে
থাকতে চাইনি
সকলি গোপন, সকলি নীরব, একা একা শুধু
বুক ভার করা
কার কাছে যাবো, কাকে যে বলবো, কেউ নেই, কোনো
নাম মনে নেই
সকলে আলাদা, নিরালায় একা, কেউ কারো মুখে
সহজে চায় না
কোনো কথা নেই, শুধুই শুকনো লৌকিকতার
লঘু চোখাচোখি
জীবন চলেছে জীবনের মতো, তার নিচে চাপা
হালকা বিপদ
বিপদের আরও অনেক গভীরে ইঁট চাপা আছে
ধিকি ধিকি রাগ
দুঃখ চেয়েছি, তা বলে এতটা দুঃখিত হতে
চাইনি জীবনে।

ফেরা না ফেরা

ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো
দেখোনি পথের কাঁটা, দেখোনি তমসা ?
স্বপ্নের ভেতরে জাগে শূল, অপাপবিদ্ধের শুভ্র
অভিশাপ হাসি

প্রতিটি ধ্বংসের পর কারা দেয় এত সকৌতুক করতালি ?
আর কেউ নেই, আমি ছাড়া আর কেউ নেই, যে দেবে নিশান
তাহলে কোথায় যাবো, কার কাছে যাওয়া এই না ফেরার পথে ?
ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো ।

দেখোনি স্থাণুর কীট ? দেখোনি সমস্ত দিন
ভুলের কাঁকর আর মুখ ভরা অনিচ্ছার ধুলো ?
এ রকম কথা ছিল ? যখন তখন সব
প্রয়াসে বিলিয়ে দেওয়া শপথ ছিলো না ?
ছিঁড়ে যাই হাজার অদৃশ্য সুতো, আরও কিছু
যার নাম মায়া
যাবো না ? যেতেই হবে, এখন না যদি যাই, তবে আর কবে ?
ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো !

কথা ছিল

এই দুরন্ত রাতের খেলা, কথা ছিল
বনের মধ্যে রেশম, এত লাল রেশম, কথা ছিল ?
বাতাস ভাঙে বিজন দ্বীপ, আকাশ ভাঙে ঘর
দুঃখ ভাঙে নরম হাত, কঠিন হাত, কথা ছিল ।
হে সুন্দর, হে আনন্দ, এত সুদূর ?
ফেরার পথ ভুলে যাবার কথা ছিল ।

খেলাচ্ছলে

'ফেরা' এই শব্দটিকে ভিজে নিয়ে চোষাচুষি করি
খেলাচ্ছলে
এবং একার খেলা কোনোদিন নিয়ম মানে না
ছাদের পাঁচিল ছেড়ে লাফ দেয় তেজী বল
উড়ে যায় ব্রীজের ওপারে

বাতাস আঁচড়ায় শীত, সন্ধ্যা আনে কালো আলোয়ান
জিভ ক্ষার হয়ে আসে, শব্দটি সশব্দ হয়ে
ভয় পাওয়ায়
এতক্ষণ একা ঠায় দাঁড়িয়ে কিসের জন্য 'ফেরা' ?
একি ফিরে আসা, নাকি ফিরে যাওয়া, কার ?
কে জানে ফেরার মর্ম, অলৌকিক এ শব্দটি কাকে
কী শেখায় !

আমি কি পৃথিবী কিছু ভারী করে আছি ?
হে মানুষ, হে মানুষী, এবার আমার দিকে
রুমাল ওড়াবে ?

মায়া সুন্দর

ফণা তোলা সাপের মতন এমন বিচিত্র সুন্দর আর কি আছে
অথচ তা পাখির মতন সুন্দর না !
তারপর সাপ চুপি চুপি ছোবল মারে পাখির বাসায়
রাত্রিতে গড়িয়ে পড়ে কান্না
সুন্দরের মধ্যে প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা হা-হা করে
অসহায় পাখি-মা একটু দূরে ডানা ঝাপটায়
তার ঠোঁটে-ধরা তখনও একটি প্রজাপতি
পুরো দৃশ্যটি ঝলসে ওঠে যুবতী জ্যোৎস্নায়
অপরূপ দেবদারু গাছটি আরও সুন্দর হ'য়ে ওঠে
কেন না তার নীচে অপেক্ষমাণ এক নারী
যে মায়া দর্পণকে প্রশ্ন করেছিলো,
বলো তো, আমার চেয়ে অসুখী আর কে আছে
সে জানে তার জন্য আজ কেউ আসবে না
এই অপরূপ মায়ার সন্নিধানে
বিচ্ছেদ আরও মধুর যে !

বাসের ভিতরে

বাসের পাদানি তটে দুটি ইঞ্চি পেয়ে যাই বহু পুণ্যফলে
বিকেল পাঁচটায়
তারপর বিহঙ্গেরা যেমন স্বাধীন, সেরকমই ভিড়ের ভিতরে
যখন যেখানে খুশি যাও,
মানুষ তরল জল, শুধু স্রোতে ভাসা
মহিলা জোয়ার ছেড়ে আরও দূরে দৈনন্দিন সুখ
ডিজেলের কটু গন্ধ, সব ঠিকঠাক।

বুকের বোতাম একটু টুপ করে খসে পড়ে সহসা এবং অকারণ
মনে মনে সর্বনাশ গণি
বোতামের এই খুনসুটি, এই নিরুদ্দেশ অতিশয় ছিরিছাঁদহীন
আমার এমনই ভাগ্য, ঠিক ওরকম আর কখনো পাবো না
খুঁতো হয়ে যাবে সব, এরকমই হয়।
ঠিক যেন জলে ডুব দেওয়া—
আমি তৎক্ষণাৎ বসি পড়ি, ব্যস্ত হাতে ধুলো ঘাঁটি
এক সঙ্গে এত পদতল, তার কাছে আমার ব্যাকুল মুখ
অনেকে চমকায় কেউ রেগে ঘোড়া হয়ে লাথি ছোঁড়ে
কেউ বা ভিখারি ভেবে তু-তু করে, কেউ জুতো-পালিশ চায় না
কোথায় বোতাম ?
কোথায় সে জলস্রোত, কোথায় সে নারী পুরুষের বুকে-বুক মাখামাখি
বাসের ভেতরে এক বাঁশবন, তার মধ্যে এক ডোম কানা।

প্রত্যাখ্যান

দেবে না চুম্বন ঐ ঠোঁটে ?
লোধ্রেণু ছড়ানো ওখানে
রূপে যেন গন্ধরাজ ফোটে
মধুলোভী সব কিছু জানে।

দেবে না আবার আলিঙ্গন ?
স্তনের ওপরে ছোঁয়া জিভ

ডঙ্কা বাজে রক্তে সর্বক্ষণ
প্রাণ যেন দ্বিগুণ সজীব !

এই বাহু জড়ানো কোমরে
তাও তুমি দূরে ঠেলে দেবে ?
গুলমোরের গুচ্ছে আজ ভোরে
রোদের আলপনা দেখো ভেবে ?
সমূহ প্রকৃতি থেকে ছেঁচে
নিয়ে আসি তোমার উপমা
তাই নিয়ে বহুকাল বেঁচে
হবে না কি পরিপূর্ণতমা ?

প্রতিহিংসা

শিমুল, শিমুল, তুই চুপ করে থাক
জানাস্ নে গোপন কথাটি
ও খুঁজে মরুক, ওর ভিটে মাটি চাঁটি
হয় হোক, ওর বুক দুঃখে পুড়ে খাক !

জারুল, জারুল, তুই দেখাস নে পথ
একা একা সে ঘুরে মরুক
ও চেয়েছে রমণীর সম্মুখ দ্বৈরথ
মাংস, ত্বক ছুঁয়ে ছেনে সুখ !

অশোক, অশোক, ওকে কর বর্ণকানা
যূথী, তুই দিস না সৌরভ
সমস্ত অরণ্যে আজ ওর ঠাঁই মানা
ও চেনেনি রূপের গৌরব ।

জলের কিনারে

এই অন্ধকার পথ চলে গেছে সমুদ্র কিনারে
যেখানে তৃষ্ণার কোনো শান্তি নেই
তবু এই তৃষিতটি কেন ঐ পথে যেতে চায় ?

সকলেরই গৃহ আছে, সকলেরই নিজস্ব সীমানা
যেখানে অর্ধেক মৃত্যু অর্ধেক জীবন
তবু এই গৃহহারা কেন যায় জলের কিনারে ?

মুখ দেখিনি

চিড়িয়া মোড়ে নেমে পড়লো দূরদেশিনী
বুক দেখেছি, ঘাড় দেখেছি, মুখ দেখিনি
মাথায় ছিল রোদের উল এলোকেশিনী
বাহুর কাছে স্বর্গ সুবাস দূরদেশিনী
বুক দেখেছি, ঘাড় দেখেছি, মুখ দেখিনি
আমার যেটুকু প্রাপ্য আমি তার বেশী নি'
ভুরুর একটু বাঁক দিলো না এলোকেশিনী
ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল দূরদেশিনী
বুক দেখেছি, ঘাড় দেখেছি, মুখ দেখিনি ।

এখানে কেউ নেই

এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন,
এই যে শালবন
টগর চেয়ে আছে, শুকনো পাতা ওড়ে
ভ্রমর ফিরে আসে,
এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন,
এই যে শালবন
এখানে প্যান্ট খোলো, এখানে শার্ট খোলো,
জাঙ্গিয়া গেঞ্জিও

এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন,
এই যে শালবন
এখানে রোদ আছে, বাতাস দেহ কাটে,
গন্ধে শিহরন
এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন,
এই যে শালবন
এখানে প্রেম হবে, দারুণ খেলা হবে,
শরীর চমকায়
এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন,
এই যে শালবন
মাটিতে গড়াগড়ি, কামড়ে ছিঁড়ে নেওয়া
নিবিড় রণ হলো
এমন রতি সুখ, এমন ভালোবাসা,
জীবনে একবার !

একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল···

একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল আর এক নৈঃশব্দ্যকে ছুঁতে
তারা বিপরীত দিকে চলে গেল,
এ জীবনে দেখাই হলো না।
জীবন রইলো পড়ে বৃষ্টিতে রোদ্দুরে ভেজা ভূমি
তার কিছু দূরে নদী—
জল নিতে এসে কোনো সলাজ কুমারী
দেখে এক গলা-মোচড়ানো মরা হাঁস।
চোখের বিস্ময় থেকে আঙুলের প্রতিটি ডগায় তার দুঃখ
সে সময় অকস্মাৎ ডঙ্কা বাজিয়ে জাগে জ্যোৎস্নার উৎসব
কেন, তার কোনো মানে নেই।
যেমন বৃষ্টির দিনে অরণ্য শিখরে ওঠে
সুপুরুষ আকাশের সপ্তরং ভুরু
আর তার খুব কাছে মধুলোভী আচমকা নিশ্বাসে পায়
বাঘের দুর্গন্ধ !

একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল আর এক নৈঃশব্দ্যকে ছুঁতে

তারা বিপরীত দিকে চলে গেল,
এ জীবনে দেখাই হলো না !

এই জীবন

ফ্রয়েড ও মার্ক্স নামে দুই দাড়িওলা
বলে গেল, মানুষেরও রয়েছে সীমানা
এঁচোড়ে পাকার মতো এর পর অনেকেই চড়িয়েছে গলা
নৃমুণ্ড শিকারী দেয় মনোলোকে হানা ।

সকলেই সব জানে, এত জ্ঞান পাপী
বলেছে মুক্তির রং সাদা নয় খাকি
তবু যারা সিংহাসন নেয় তারা কথার খেলাপী
এবং আমার ভাই, মা-বোন নিখাকী ।

ছিঁড়েছে সাম্রাজ্য ঢের, নতুন বসতি
পুরোনো হবার আগে দু'বার ওল্টায়
দিকে দিকে গণভোটে রটে যায় বেশ্যারাও সতী
রং পলেস্তারা পড়ে দেয়ালে চল্টায় ।

এ রকম চলে আসে, তবু নিরালায়
ছোট এক কবি বলে যাবে সিধে কথা
সূর্যাস্তের অগ্নিপ্রভা লেগে আছে আকাশের গায়
জীবনই জীবন্ত হোক, তুচ্ছ অমরতা ।

আমাকে জড়িয়ে

হে মৃত্যুর মায়াময় দেশ, হে তৃতীয় যামের অদৃশ্য আলো
তোমাদের অসম্পূর্ণতা দেখে, স্মৃতির কুয়াশা দেখে আমার মন কেমন
করে
সারা আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পরম কারুণিক নিষাদ
তার চোখ মেটে সিঁদুরের মতো লাল, আমি জানি তার দুঃখ

হে কুমারীর বিশ্বাসহন্তা, হে শহরতলির ট্রেনের প্রতারক
তোমাদের টুকিটাকি সার্থকতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরোনো
মাছের আঁশ
হে উত্তরের জানালার ঝিল্লি, হে মধ্যসাগরের অভিযাত্রী মেঘদল
হে যুদ্ধের ভাষ্যকার, হে বিবাগী, হে মধ্য বয়সের স্বপ্ন, হে জন্ম
এত অসময় নিয়ে, এমন তৃষ্ণার্ত হাসি, এমন করুণা নিয়ে
কেন আমাকে জড়িয়ে রইলে,
কেন আমাকে…

আত্মদর্শন

অস্ত্র বানিয়েছিলুম পশুর বিরুদ্ধে, আজ পশুরা নিঃশেষিতপ্রায়
যে ক'টি রয়েছে, তাদের আদর যত্নে রেখেছি সাজানো বাগানে
এদিকে জমে গেছে অস্ত্রের পাহাড়
দিবাবসানের রক্ত আলোয় দেখা যায় মানুষের স্রোত
চতুর্দশী চাঁদের দিকে রোমহর্ষক ব্যস্ততা
যন্ত্র কষে দেয় ন্যায় অন্যায়ের হিসেব
কুকুরে চাটে পরমান্নের থালা, বিনা বাধায় ছুঁয়ে দেয় যজ্ঞ-পুরোভাস।

বীজাণুর চেয়েও দ্রুতবেগে বেড়ে-ওঠা মানুষ এগিয়ে আসে
নিজের মুখচ্ছবিকেই সে ভয় পায়
ভাদ্রমাসের ব্যাঙ আশ্রয় নেয় মানুষের গলায়
জলে-রোদ্দুরে স্নান ক'রে মাঠে হাল ধরে আছে পাঁচ হাজার বছরের
পুরোনো মানুষ
আর নগরে বন্দরে নতুন মানুষেরা ছুঁয়ে আছে অস্ত্রের বোতাম
কেউ কারুর নয়, শোনা যায় এই নিঃশব্দ হাহাকার, কেউ কারুর নয়
কেউ নদীর জলে একলা চোখের জল মেশায়
রঙ্গালয়ে কোমর-লোভী যুবকের হাত অনায়াসে যা চায় তা পায়
সে জানে না সে সাতাশটি মৃত্যুর জন্য দায়ী
পাপবোধ নিয়ে লেখা হয় কাব্য আর নিরপরাধ কারাগারে বসে
খোঁটাখুঁটি করে চাম পোকা
রাস্তায় ছোটাছুটি করে অনিচ্ছার ফসলের মতন শিশু
কেউ কারুর নয়, শোনা যায় এই নিঃশব্দ হাহাকার, কেউ কারুর নয়

অথচ ভালোবাসার কথা ছিল, অথচ মানুষ মানুষের কাছাকাছি
আসার কথা ছিল
ভূলুণ্ঠিত জ্যোৎস্নায় মিশে আছে বহু শতাব্দীর মনীষা
চতুর্দিকে সঙ্ঘ ভেঙে যাবার সংঘর্ষ
চতুর্দিকে ভেঙে যাবার অসম্ভব শব্দ, ঠিক যেন ওঙ্কারের মতন
কেউ শোনে না...

অবেলায় প্রেম

তুমি কি বিশ্বাস ভুলবে, বলবে এসে, প্রথম তরুণ
আমাকে মৃত্যুর থেকে তুলে নাও, মুহূর্তে বাঁচাও চোখ তুলে
অথবা মুহূর্ত যেন জন্মান্তর পায়, যেন পাপহীন ভুলে
সুকুমার স্তন ওষ্ঠ জঙ্ঘামূল, ভবিষ্যৎ ভ্রূণ
অচিরাৎ সৌন্দর্যের এ পান্থনিবাসগুলি বেঁচে বর্তে থাকে !
বিবিধ অপ্রেম এসে না হয়তো শরীরের মাংস ছিঁড়ে খাবে ।
তুমি কি ঝড়ের মধ্যে ছুঁয়ে যাবে সর্বস্ব শিকড়হীন সন্ধ্যায় আমাকে
বিশ্বাস ভাঙার শব্দ সঙ্গীতের মতন শোনাবে ?

কেন না বাঁচানো যায় না, রূপ রস গন্ধে প্রতিশোধ
স্পন্দনে ঢোকায় বিষ, বহু সাময়িক মৃত্যু ফলভোগ করে
তোমাকে সময় থেকে তুলে নেবো, শৈশবের এই প্রিয় বোধ
পশ্চিমে চলেছে, দেখ, পশ্চিম কী রমণীয়, অন্ধকার ঘরে
এখন পিশাচ সিদ্ধ অগ্নি জ্বলে, কাপুরুষ লোভে জাগে স্নায়ু
এখন প্রার্থনা নেই, অপমৃত্যু আমাদের কেড়ে নেবে আয়ু ।

দেখা হবে

দেখা হবে চৌরাস্তায় বুধবার বিকেল পাঁচটায়
অথবা যদি না পারি
দেখা হবে নদীতীরে বালার্ক উষায়
কামানের ঘোর শব্দ যখন জোয়ার-স্রোত ভাঙে
অথবা যদি না যেতে পারি

দেখা হবে স্কুল-পথে যেমন শৈশবে
বারবার দেখা হয়ে যেত
একটি চাহনি কিংবা দু' পলক হাসির ঝিলিক
দেখা হবে অশ্লেষায়, পরাজিত ঘোর অবেলায়
দেখা হবে শৃঙ্খলিত দিনে কিংবা নিকষ রাত্রিতে
অথবা যদি না যেতে পারি
যদি সব পথ জুড়ে খাড়া থাকে উল্লুকের পাল
প্রলয়ের শেষে দেখা হবে।

ভালোবাসা

ভালোবাসা নয় স্তনের ওপরে দাঁত ?
ভালোবাসা শুধু শ্রাবণের হা-হুতাশ ?
ভালোবাসা বুঝি হৃদয় সমীপে আঁচ ?
ভালোবাসা মানে রক্ত চেটেছে বাঘ !

ভালোবাসা ছিল ঝর্নার পাশে একা
সেতু নেই তবু অক্লেশে পারাপার
ভালেসবাসা ছিল সোনালি ফসলে হাওয়া
ভালোবাসা ছিল ট্রেন লাইনের রোদ।

শরীর ফুরোয় ঘামে ভেসে যায় বুক
অপর বাহুতে মাথা রেখে আসে ঘুম
ঘুমের ভিতরে বারবার বলি আমি
ভালোবাসাকেই ভালোবাসা দিয়ে যাবো।

তুমি আমি

গরীব না খেয়ে থাকে, গরীব রাস্তায় শুয়ে থাকে
তুমি আমি জমি কিনি, রবিবারে রুই মাছের মুড়ো
এসব দোষের নয়, আত্মসুখ কে না চায়, বলো ?
যেখানেই যাও তুমি, গরীব ও ভিখিরির বড় আবর্জনা

তুমি আমি চলে যাই সমুদ্রে বা পাহাড়ে হুল্লোড়ে
গরীব কোথায় নেই, গরীবেরা বীজাণুর মতো
মাঝে মাঝে ক্ষোভ হয়, মনে হয় কিছু করা যাক
তুমি আমি সভা করি, সমবেত মিছিলে গর্জাই
বিমানেরর পেটে ঢুকে রাজধানী যাওয়া-আসা করি।
গরীবের জীবনের দাম আছে, এ রকম সার সত্য বলে
নিজের জীবন বীমা মাসে মাসে সুরক্ষিত থাকে।
গরীবের কথা ভেবে মনে পড়ে তোমার আমার
চেয়ে আরও কত বেশি ধনীরা রয়েছে কেন, কেন ?
আরও গায়ে জ্বালা ধরে গরীবের জন্য দুঃখ বাড়ে
গরীবের নাম নিয়ে মদের টেবিলে ওঠে ঝড়।
গরীব না খেয়ে থাকে, গরীব রাস্তায় শুয়ে মরে
যেমন আপন মনে বহুকাল এমনই মরেছে
তুমি আমি কষ্ট পাই, কবিতার খুব রেগে উঠি।

প্রাণের প্রহরী

কা ব্য না ট ক

[একজন ডাক্তারের চেম্বার। সাহেব পাড়ায়। সন্ধের পর এ অঞ্চল নিঝুম হয়ে আসে। চেম্বারটি বেশ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। টেবিল ও অনেকগুলি চেয়ার ছাড়াও একটি কালো রেক্সিনে মোড়া গদির বিছানা। সেখানে দু'জন বয়স্ক যুবক বসে আছে। এদের নাম প্রতীক ও সংবরণ।

ডাক্তারের দশাসই চেহারা। গলার আওয়াজ গমগমে। তাঁর নাম হৃষীকেশ। সবাই ঋষি বলে ডাকে। তিনি একটু চেঁচিয়ে কথা বলেন, অনেকটা নাটুকে ধরনের। তিনি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রৌঢ় চেহারার শিশু।

দূর থেকে ডাক্তারের গলার আওয়াজ শোনা যায় : ব্যাপারটা কী ? ব্যাপারটা কী ? ব্যাপারটা কী ?]

প্রতীক : ঐ আসছে ঋষি, সারা পাড়াটা কাঁপিয়ে
সংবরণ : সারাদিন এত খাটনি, তবু ওকে ক্লান্ত হতে দেখি না কখনো।
ডাক্তার : ব্যাপারটা কী হে। এত চুপচাপ
বসে আছো কেন ? দূর থেকে ভাবলাম
কেউ নেই, আলো জ্বলছে, যেন বাগানের মধ্যে একটা ঘর।

কী রে সংবরণ, কী যেন ভাবছিস মনে মনে ?

প্রতীক : চুপচাপ থাকবো না কি, নাচানাচি
করবো দু'জনে ?

সংবরণ : আর ঠিক পাঁচ মিনিট দেখতাম, তারপর
কেটে পড়তাম।

ডাক্তার : আরে বোস্ বোস্, এত রাগারাগি কেন,
আমি একা বহুক্ষণ এখানে ছিলাম। এসময়
কোনো সুস্থ মানুষের দেখা পেতে খুব
মন চায়। সারাদিন রুগী আর রুগী !
কটা বাজলো ?

প্রতীক : সাড়ে আটটা, না, না, তার পাঁচ মিনিট কম

ডাক্তার : যথেষ্ট হয়েছে ! আজ রুগী দেখা এখানে খতম ?
কানাই, কানাই, কেউ এলে বলবি, আটটার পর
সব অসুখের ছুটি। আমি নেই, দরজা বন্ধ কর,
এখন আনন্দ হবে, ফুর্তি হবে....
কে ওখানে ?

সংবরণ : কেউ না তো ?

ডাক্তার : মনে হলো একটা ছায়া

সংবরণ : কিছু নেই

ডাক্তার : ওফ্, এক পার্শী মহিলাকে দেখে আসছি এই মাত্র,
মাগীর অসুখ নেই কোনো

সংবরণ : ল্যাঙ্গোয়েজ ! ল্যাঙ্গোয়েজ !

ডাক্তারা : যত বলি, মা-জননী, তোমার তো অসুখ কিচ্ছু না !
তবু ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে বলে, ঠিকমতো ওষুধ দিচ্ছো না !
এখানে সেখানে ব্যথা, প্রতিদিন ঘুম যাচ্ছে কমে,
বড়লোক, টাকার বাণ্ডিল, ঘুম হয় টাকার গরমে ?
প্রেসার নর্মাল, স্টুল, ইউরিন, কিংবা রক্তে চিনি,
সমস্ত পরীক্ষা করে দেখা হলো, স্বাভাবিক। তবু
প্রতিদিনই
ডাক পড়ে

প্রতীক : আহ্ ঋষি, রাত্তির অনেক হলো, আমরা এখনো
পেচ্ছাপ বাহ্যির কথা শুনবো ? এর মানে হয় কোনো ?

ডাক্তার : না, না, ফুর্তি হবে, আজ ফুর্তির দরকার
আমারই সবচেয়ে বেশি। কে ওখানে ?

সংবরণ : কেউ না তো ?
ডাক্তার : মনে হলো, ঠিক যেন কোনো
মেয়ে, বার-বার ভুল হচ্ছে কেন এরকম ?
প্রতীক : টাকার ধান্দায় এত পরিশ্রম !
এরপর চোখে সর্ষেফুল দেখবে তুমি, ঋষি !
ডাক্তার : (নিচু গলায়, আগেকার ভাষায় যাকে বলা হতো
'জনান্তিকে' । অর্থাৎ তাঁর এ-কথাটা অন্য কেউ শুনতে
পাবে না)
না, সে রকম নয় । ঠিক বাবলুর অসুখের পর
একটি নারীর ছায়া দেখতে পাই ক'দিন অন্তর
চুপ করে দরজার পাশে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়
আবার চোখের এক পলক ফেলার আগে চলে যায়
আমি তো চিনি না, ওকে ?
প্রতীক : মেয়েটি কেমন দেখতে ?
ডাক্তার : (চমকে) কোন্ মেয়েটি ?
প্রতীক : ঐ যে পার্শী মেয়েছেলে, যার কথা তুমি বলছিলে !
ডাক্তার : অসুন্দর পার্শী আমি এ পর্যন্ত দেখিনি কখনো,
ডাক্তারি শাস্ত্রের মতে যে শরীরে রোগ নেই কোনো
তবুও অসুখ থাকে সেখানেও । এই যে মহিলাটি,
রোগ নেই, তবু তিনি অসুস্থ যে সে কথাও খাঁটি !
সংবরণ : তোমাদের প্রচণ্ড সুবিধে,
শুধু আমাদের যা কিছু দুর্ভোগ
যে অসুখ সারাতে পারো না, বলে দাও,
'ওটা মানসিক রোগ !'
ডাক্তার : হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! সকলেরই খুব রাগ ডাক্তারের প্রতি,
অথচ ডাক্তার ছাড়া চলেও না, কিছু হলে কাকুতি মিনতি !
অন্যান্য সময়ে দূর শালা ! মনের অসুখ চিনে নিতে
ভুল তো হতেই পারে । ইচ্ছে আছে মনটাকে ল্যাবরেটরিতে
একদিন ঠেসে ধরবো । পঞ্চভূত মানুষের দেহে
ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু আর ব্যোম । অত্যন্ত সস্নেহে
শরীর এদের পোষে । এর মধ্যে পঞ্চমটি বাদে
বাকি চারিটিকে ঢের নেড়েচেড়ে দেখা গেছে, কিন্তু গোল বাধে
অদ্ভুত জিনিসটি নিয়ে, ঐ ব্যোম, অর্থাৎ শূন্যতা
তার কোনো দিশা নেই, কোনো শাস্ত্রে নেই তার কথা ।

সংবরণ : এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা আছে, তা পড়োনি বুঝি ?
তা পড়বে কেন ? ডাক্তারেরা বই-টই পড়ে না। শুধু মাত্র রুজি রোজগারের ধান্দাতেই মত্ত

ডাক্তার : বাজে কথা বলো না হে ! প্রতিদিন দশ কি বারোটি
গ্রন্থপাঠ করি আমি। মানুষের নোখ থেকে মাথার করোটি,
হাড় মজ্জা রক্তের জীবন, এর চেয়ে বড় গ্রন্থ আছে ?

প্রতীক : এ সমস্ত শস্তা দার্শনিকতা দিয়ে পেট ভরবে ভাই ?
ঢের হলো ! মাল কড়ি ছাড়ো কিছু মাল টাল খাই ?

ডাক্তার : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফুর্তি হবে, আজ ফুর্তির দরকার
আছে খুব আমার নিজেরই। মন ভালো নেই।
দিতে হবে এক ডুব ফুর্তির সাগরে কিছুক্ষণ।
কে, কে ওখানে ?

প্রতীক : জ্বালানে দেখছি আজ ? থেকে থেকে বারবার কে, কে ?
ভুল হতে হতে তবু মানুষ তা খানিকটা শেখে ?
রাত্তিরে ঘুমোও না বুঝি ?

ডাক্তার : না, না, ভুল নয়, খুব স্পষ্ট চোখে দেখা
বাবলুর অসুখের পর থেকে
[নেপথ্যে একজন কেউ ডাকলো, ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু ! নদীতে মাঝিরা যে রকম সুর করে জল মাপে, সেই রকম কণ্ঠস্বর।]

সংবরণ : ঐ তো এসেছে কেউ

প্রতীক : ফের কোনো রুগী-টুগী

সংবরণ : এ লোকটিই বহুক্ষণ থেকে আছে দরজার পাশে

ডাক্তার : না, না, এ সে নয়। একে জানি। চিনি এর গলার আওয়াজ
মাঝে মাঝে আসে। সাত দিন পর আবার এসেছে বুঝি আজ।
[আগন্তুকের প্রবেশ। বৃদ্ধ, মুখে সাতদিনের পাকা দাড়ি। একটা রঙ জ্বলে যাওয়া নীল জামা গায়, সে আর কারুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে শুধু ডাক্তারের দিকে চেয়ে থাকে।]

আগন্তু : ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার : কে, ধরণী ?
আবার এসেছো, তুমি এখনো মরোনি

আগন্তু : (সাগ্রহে) মরবো, ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার : মরার কি অন্য কোনো জায়গা পেলে না ?
আমার কাছেই বুঝি আছে শুধু দেনা ?

আগন্তু : মরবো, ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার : সাতদিন কোথা ছিলে ? ফের চাড়া দিয়ে উঠে এলে ?

আগন্তু : মরবো, ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার : চুপ করো ! মরণের উচ্চারণ এখানে নিষেধ !

[ডাক্তার পকেট থেকে তিরিট চল্লিশটা টাকা বার করে দিলেন। লোকটি কোনো কৃতজ্ঞতা বা নমস্কার না জানিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।]

প্রতীক : কী ব্যাপার লোকটাকে দিলে এত টাকা ?
আমাদের ফুর্তির খোরাক সব ফাঁকা ?

সংকরণ : আগেও দেখেছি, তুমি ঐ বুড়োটাকে টাকা দাও, ব্ল্যাকমেল নাকি ?

ডাক্তার : ব্ল্যাকমেলই বটে ! এই বুড়ো লোকটি প্রাক্তন নাবিক,
ছিল জলে ভ্রাম্যমাণ। এখন ডাঙায় এসে দিক
হারিয়েছে। ও চেনে না শহরের বাঁধা পথ ; মাটির নিয়ম
ও জানে না। সংসারের বুদ্ধি ওর কম
ও বোঝে না নিজের সুবিধে
বাড়িতে পাঁচটি বাচ্চা, রোগা বউ, আর আছে খিদে
বেকারের খিদে পাওয়া বড় দোষ
বেকারের ছেলেদের খিদে পাওয়া আরও বেশি দোষ !

প্রতীক : আবার দুঃখের গপ্পো ! আজ শুধু অনন্ত ঝামেলা।

ডাক্তার : না, না, না, না ; এবারই তো শুরু হবে খেলা !

সংবরণ : ও বেকার, কিন্তু তুমি কেন দিতে যাবে ওর অন্ন ?
তুমি কি সমাজ ? নাকি রাষ্ট্র ? নাকি দাতাকর্ণ ?

ডাক্তার : সে সব কিছু না। আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন চর্যায়
এরকম ফাঁক থাকে। ঐ লোকটা শূন্য হাতে বাড়ির দরজায়
যদি ফেরে, ঠিক পাখির ছানার মতো, পাঁচটি হাঁ করা মুখ
মেলে আছে, ওরা রোগী, এর নাম খিদের অসুখ !
ও তো পয়সা চায় না,
বিষ চায় ! দু' তিনবার ওর বাড়ি গেছি।
যা দেখেছি,
মনে হয়, এতকাল বইপত্রে যা কিছু শিখেছি
সেখানে উত্তর নেই এসবের।
এ পর্যন্ত খিদের ওষুধ বেরিয়েছে ? তবে ?
নাকি বিষ দেবো ?
আমি তো ডাক্তার, কিছু দিতে হবে—

প্রতীক : ওসব বাতেলা ছাড়ো, মাল আনো

মালের উৎসবে
বুঁদ হয়ে থাকি। তুমি অতি বুদ্ধু তাই এখনো উত্তর
চাও, এখনো বিবেক নিয়ে প্যানপান, ধুত্তোর

ডাক্তার : কানাই, নিয়ায়, আজ ফুর্তি করি,
মন ভালো নেই
আমার নিজের ছেলে হাসপাতালে

সংবরণ : এমন ফুটফুটে ছেলে, তার কিছু হতেই পারে না

ডাক্তার : সুইডেন থেকে তার জন্য কিছু অ্যামপিউল, কেনা
বিশেষ দরকার

প্রতীক : 'মাই সান, মাই এক্সিকিউশানার'

ডাক্তার : (চমকে) তার মানে ?

প্রতীক : 'ওরে পুত্র, জল্লাদ আমার',

ডাক্তার : কার পুত্র ? কে জল্লাদ ?

প্রতীক : প্রত্যেক পিতার পুত্র, পিতার জল্লাদ
এক ছোকরা এই নিয়ে লিখেছে কবিতা।
দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু, দিনে দিনে বড় হয় ছেলে
আর তুমি, তার পিতা ততই মৃত্যুর দিকে যাও তুমি হেলে !

ডাক্তার : এক্ষেত্রে আমিই বুঝি পুত্র হন্তা, সেই বুঝি ভালো···
মাত্র ন'বছর, এর মধ্যে মৃত্যু শিয়রে দাঁড়ালো।
এ কি প্রতিশোধ ?
আমি বহুবার বহু বাড়ি থেকে
মৃত্যুকে ফেরাই।
তাই মৃত্যু এবার কি জাল ফেলে ছেঁকে
আমারই সংসারে দেবে থাবা ?

সংবরণ : কী রকম আছে বাবলু ?

ডাক্তার : যখন ঘুমন্ত থাকে, ভালো থাকে,
হাসে, কথা বলে,
সত্যিই ঘুমের মধ্যে হাসে কথা বলে। যখনই সে জেগে ওঠে,
অসহ্য যন্ত্রণা,
যেন কাকে দ্যাখে
ক্যাবিনের বাইরে, কেউ নেই তবু দ্যাখে

সংবরণ : কী ঠিক অসুখ ওর ?

ডাক্তার : নেফ্রটিক সিনড্রম। ঠিক বুঝবে না তোমরা,
দুটি কিডনিতেই অজানা অসুখ

সংবরণ : অজানা অসুখ ?

ডাক্তার : আশ্চর্য হলে কি ? শুধু মন নয়,
মনুষ্য শরীরে
এখনো অচেনা কিছু রয়ে গেছে

প্রতীক : বিশ্বাস করি না ! তুমি চিকিৎসা ছেড়ে মন্ত্র নাও

সংবরণ : কিডনির অসুখ ? আজকাল প্রায়ই শুনি
মাদ্রাজে ভেলোরে,
চমৎকার সেরে যায় সব···

প্রতীক : আরও একটু সরে
হোয়াইট ফিল্ড গ্রামে যাও, ছাই ভস্ম,
হাওয়া থেকে ফুল...

ডাক্তার : ও সমস্ত কথা থাক, এসো খাই

সংবরণ : ঋষি, তুমি বড়ই অস্থির হয়ে আছো

ডাক্তার : হয়তো বাঁচানো যায়, আজ থেকে মাস দেড়েক আগে
ডাক্তার লোম্যান নামে একজন সেন্ট পিটার্সবার্গে
পরীক্ষা চালিয়েছেন বাঁধা-মৃত্যু দশজন রোগীর শরীরে
নতুন ওষুধ কিংবা বিষ—ফল হলো ঠিক যেন মেঘ চিরে
হঠাৎ বিদ্যুৎ কিংবা বজ্রপাত কিংবা আশীর্বাদ,

পাঁচজন বেঁচে গেছে, পাঁচটি বাঁচেনি !

সংবরণ : পাঁচজন বেঁচে গেছে, পাঁচটি বাঁচেনি ?
এ যে সাঙ্ঘাতিক
এ কি সার্থকতা নাকি ব্যর্থতারই আর এক দিক

ডাক্তার : যাক আর ঐ কথা নয়। ভুলে থাকতে চাই
ফুর্তি হোক। শালা মরণের মুখে ছাই
দাও, তুড়ি মারো, এই তো এসেছে, গ্লাসে ঢালা
কে ওখানে ?
কে ওখানে ?

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হাসপাতাল, ক্যাবিনের মধ্যে খাটে ঘুমিয়ে আছে বাবলু। ন' দশ বছর বয়েস। তাকে ঘিরে চার-পাঁচজন ডাক্তার। সকলের মুখ মেঘলা, ঋষি তাঁর অধ্যাপক এক প্রবীণ ডাক্তারকে শেষবার অনুরোধ করলেন :]

ঋষি : স্যার, নতুন ওষুধ এইমাত্র আমি নিজে
সব ঝুঁকি নিয়ে ভেবেচিন্তে ভরেছি সিরিঞ্জে,
আপনি দিন

স্যার : ঋষি, তুমি ক্ষমা করো, আমাকে বলো না
বুড়ো হয়ে গেছি, আজকাল হাত কাঁপে

ঋষি : স্যার, কে না জানে আজও কলকাতা কিংবা
সারাদেশে আপনার তুল্য চিকিৎসক বেশি নেই

স্যার : তবু তুমি ক্ষমা করো এই বৃদ্ধটিকে !
যে ওষুধ পরীক্ষিত নয়, জেনেশুনে তা আমি কী করে
দিই ?
তোমার সন্তান সে যে আমারও অনেক আদরের।
ওকে আমি কী করে অজানা পথে নিয়ে যাবো, বলো ?

ঋষি : (অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে) ডক্টর লাহিড়ী, আমি
আপনাকে যদি

লাহিড় : না, না, ঋষি ক্ষমা করো

ঋষি : ডাক্তার সামন্ত ? আপনিও ভয় পেয়ে

সামন্ত : ভয় নয়, ঋষি, এ যে অর্ধেক হত্যার
ঝুঁকি নেওয়া

ঋষি : অর্ধেক জীবন ? তার ঝুঁকি নেওয়া যায় না ?
ঠিক আছে। তা হলে আমিই নিজে পুত্রাঘাতী হবো,
নিজ হাতে এই বিষ আমি ওর শরীরে মেশাবো।
আপনারা সবাই বাইরে যান তবে
[ঘর খালি। ঋষি ছেলেকে ডাকলেন]

ঋষি : বাবলু, বাবলু, ঘুম থেকে উঠে আয়, আমরা
দু'জনে ফের ভোরবেলা বাগানে বেড়াবো

বাবলু : বাবা—

ঋষি : বাবলু, বাবলু

বাবলু : বাবা, তুমি কত দূরে ?
ঋষি : এই তো এখানে আমি, শিয়রের কাছে
বাবলু : ভীষণ যন্ত্রণা ! বাবা তুমি হাত ধরে নিয়ে যাও,
আমাকে অনেক দূরে এমন কোথাও
যেখানে একটুও ব্যথা নেই—
ঋষি : এই দ্যাখ, আমার ডান হাতে ছুরি, আমি
চোখের নিমেষে
তোকে নিয়ে যাবো সব যন্ত্রণার শেষে
এক শান্ত অন্য দেশে
বাবলু : খুলতে পারি না চোখ, এত ব্যথা,
কেন এত ব্যথা ?
ঋষি : চোখ যে খুলতেই হবে, অন্ধকারে কী করে না
দেখে
যাবি সেই অন্য দেশে ?
বাবলু : ছুরি নেই ? ঐ যে ইঞ্জেকশান !
ঋষি : বাবলু, বাবলু, শোন,
খুব মন দিয়ে তুই শোন,
সিরিঞ্জে ভরেছি আমি নতুন ওষুধ কিংবা বিষ
হয়তো উঠবি বেঁচে, কিংবা চলে যাবি পরপারে
যদি পরপার বলে কিছু থাকে, সেখানে আমাকে দোষ দিস, ভেবে
নিস, বাবা তোকে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায়
পাঠিয়েছে সেইখানে। আর যদি কোনোক্রমে বেঁচে
উঠিস তা হলে সেটা তোরই নিজের জয়।
বাবলু : বাবা, তুমি সব যন্ত্রণার শেষ করে দাও
ঋষি : দেবো, তাই দেবো, তোর মা আমাকে মাথার
দিব্যিতে
নিষেধ করেছে, বুঝি কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবে।
আত্মীয়-বন্ধুরা, চিকিৎসক, কেউ রাজি নয়
তুই রাজি ? তুই ছেলেবেলা থেকে দারুণ সাহসী
বাবলু : আমি রাজি। আমাকে ওষুধ দাও, কিংবা বিষ
ঋষি : তাই হোক। চোখ চেয়ে থাক্
[মৃত্যুর প্রবেশ। মহাভারতের বর্ণনার মতন অনেকটা তার রূপ। সে একটি নারী। সর্বাঙ্গে কালো পোশাক। নতুন তামার বাসনের মতন গাত্রবর্ণ। পিঠের ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর ফলের মতন কোঁকড়ানো

চুল। তার চোখে জল]

মৃত্যু : একটু দাঁড়াও ঋষি। কথা আছে

ঋষি : কে তুমি ?

মৃত্যু : চেয়ে দেখো। খুব কি অচেনা লাগে ? বহুবার
দেখা
হয়েছে তোমার সঙ্গে

ঋষি : তুমি নেই ? খরা মাঠে বিমানের ছায়ার মতন
চকিত মিলিয়ে যাও

মৃত্যু : বারবার ফিরে আসি

ঋষি : আমাকে না দেখে বুঝি মন কাঁদে ? এমন প্রণয় ?
আপাতত বাইরে যাও

মৃত্যু : আমি এই শিশুটির অনন্তকালের ধাত্রী
আমি তমসার মধ্য দিয়ে ওর হাত ধরে
নিয়ে যাবো

ঋষি : তুমি এই ছেলেটিকে জননীর কোল থেকে ছিঁড়ে
নিয়ে যেতে চাও

মৃত্যু : আমি এই শিশুটিকে কালের সীমানা ভেঙে শুধু
অসীমে পাঠাবো, দাও···

ঋষি : ওর মা'র স্নেহ, আর আমার বুকের ভালোবাসা
তাও কি অসীম নয় ? পৃথিবীর এই মায়াপাশ
যদি ছিন্ন করো বারবার, তবে কেন তা বেছাও ?

মৃত্যু : ঋষি, তুমি দেখেছো অনেক মৃত্যু, শুভ ও অশুভ
তবু কেন অস্থিরতা ? সব মিথ্যে আমি শুধু ধ্রুব

ঋষি : তুমি অহংকারী, তবু তোমার দু' চোখে
কেন জল ? তোমার কি চক্ষু রোগ ?

মৃত্যু : আমার হৃদয় নেই, তবু আমি দুঃখী।
আমি একা।
আমার আকাঙ্ক্ষা নেই, তবু আমি নিত্য ভ্রাম্যমাণা,
অনধিকারিণী আমি, অথচ আমিই হাত পাতি

বাবলু : বাবা, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো ?

ঋষি : কেউ না, বাবলু সোনা ! নিছক মনের ভুল,
ছায়া।

বাবলু : বাবা, তুমি সব ব্যথা শেষ করে দাও

ঋষি : এই তো এক্ষুনি দিচ্ছি, দেখি ডান হাত

মৃত্যু : ঋষি, থামো
ঋষি : আঃ, বিরক্ত করো না, যাও
মৃত্যু : ঋষি, তুমি হেরে যাবে
ঋষি : যাই যাবো। তবু আমি কোনোদিন না লড়ে
ছাড়িনি
তুমি নয়, মৃত্যু নয়, জীবনের কাছে আমি ঋণী !
তুমি নারী, তুমি সরো, যমরূপী পুরুষ পাঠাও
যার সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, তুমি যাও।
মৃত্যু : শোনো ঋষি, কেন এই চঞ্চলতা, এখনো দু' মাস
দিতে পারি ওর আয়ু, এখনো রয়েছে ওর শ্বাস,
কেন তা থামাবে তুমি ? এই পৃথিবীর রূপ রস
আরও কিছুদিন ওর প্রাপ্য, ওর নবীন বয়স
দ্বিগুণ শক্তিতে সব নিতে পারে, ততটুকু নিক
আমি ওকে স্নেহ দিয়ে ঘিরে রাখবো জননী অধিক !
ঋষি : কে চায় তোমার কৃপা ? আমি আছি প্রাণের প্রহরী।
শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে লড়ে যাই, মুষ্টি মধ্যে ভ্রমরকে ধরি।
এই যে তরল বিষ, এর মধ্যে অর্ধেক জীবন,
অথবা অর্ধেক মৃত্যু, দেখি আমি এর মধ্যে কোন্
অর্ধাংশটি জিতে যায়, আমি আছি জীবনের দিকে
—তোমার সন্তান নেই, রাক্ষসিনী, তাই তুমি এই শিশুটিকে
নিয়ে জয়ী হতে চাও ?
রাক্ষসিনী, রাক্ষসিনী !
মৃত্যু : ঋষি, শান্ত হও
বাবলু : বাবা, বড় ব্যথা, তুমি ব্যথা শেষ করে দাও
ঋষি : দেবো রে, বাবলু সোনা, দেখি ডান হাত
মৃত্যু : ঋষি, শোনো
ঋষি : চুপ !
[ঋষি ইঞ্জেকশানের সূচ ছুরির ভঙ্গিতে ঢুকিয়ে দিলেন বাবলুর হাতে। বাবলু দু'বার বাবা বলে ডেকেই থেমে গেল হঠাৎ। তার গলায় সেতারের তার ছেঁড়ার মতন শেষ শব্দ হলো। ঋষি সে দিকে একটুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থেকে সিরিঞ্জটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।]
মৃত্যু : ঋষি, তুমি হেরে গেলে
ঋষি : (শান্ত ভাবে) জানি। ওর ব্যথা শেষ হয়ে
গেছে

মৃত্যু : আগেই বলেছি হেরে যাবে

ঋষি : খেলতে এসেছি তাই আমি জানি খেলার নিয়ম,
হারজিৎ আছে। শুধু তুমি আর তোমাদের যম
কখনো হারো না, শুধু জয় নিয়ে দারুণ উল্লাস।
এবার তো সুখী হলে ? নিয়ে যাও শিশুটির লাশ।
আমার প্রাণের টুকরো এই শিশু

মৃত্যু : সুখী নই, সুখী নই
যতবার জিতে যাই, ততবার মনে মনে হারি
অনন্ত কালের মধ্যে
আমি এক সুখ-শূন্য নারী।
এই হাত দুঃখ দিয়ে গড়া, চোখ দুঃখের সমাধি
এসো ঋষি, তুমি আমি দু'জনেই একসঙ্গে কাঁদি।

এর পর ঋষি ও মৃত্যু দু'জনে বাবলুর দু'পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু কেউই চোখের জল ফেলে কাঁদে না। তারপর মৃত্যু হাত বাড়িয়ে বাবলুকে ছুঁতেই ঋষি মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন যবনিকা নামে।

[এই কাব্য নাটকটি কেউ অভিনয় করতে চাইলে আগে লেখকের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। অভিনয়ের সময় লাইনগুলি কবিতার মতন নয়, গদ্যের মতন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উচ্চারণ করতে হবে। এবং দক্ষিণা স্বরূপ লেখককে দিতে হবে অন্তত একটি নীল রঙের জামা কলারের সাইজ, আটত্রিশ।]

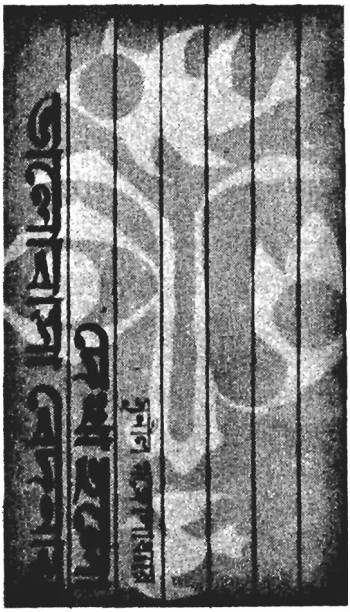

দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়

সূচিপত্র

দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায় ১৩৩, কথা ছিল না ১৪১, দুর্বোধ্য ১৪২, দীর্ঘ কবিতাটির খসড়া ১৪২, এই জীবন ১৪৩, নিজের কানে কানে ১৪৪, দুঃখ ১৪৫, দ্বিখণ্ডিত ১৪৫, ইচ্ছে হয় ১৪৬, কথা আছে ১৪৬, নেই ১৪৭, যাত্রাপথ ১৪৭, ছিল না কৈশোর ১৪৮, সেই লেখাটা ১৪৯, একটা মাত্র জীবন ১৪৯, যা চেয়েছি ১৫০, কবির মিনতি ১৫০, নদীর ধারে ১৫১, গোল্লাছুট ১৫২, সেদিন ১৫২, হে পিঙ্গল অশ্বারোহী ১৫৩, একজন মানুষের ১৫৪, মনে পড়ে যায় ১৫৫, এরকম ভাবেই ১৫৬, কাছাকাছি মানুষের ১৫৬, মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো ১৫৭, কৃত্তিবাস ১৫৭, হে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ ১৫৮, যবনিকা সরে যায় ১৫৯, এখন ১৫৯, কবিতা হয় না ১৬০, পুনর্জন্মের সময় ১৬১, সারাটা জীবন ১৬২, শিল্প ১৬২, দরজার পাশে ১৬৩, কোথায় গেল, কোথায় ১৬৪, ব্যর্থ প্রেম ১৬৪, চোখ নিয়ে চলে গেছে ১৬৫, কিছু পাগলামি ১৬৬, দেখি মৃত্যু ১৬৭, মেলা থেকে ফেরা পথে ১৬৮, লেখা শেষ হয়নি, লেখা হবে ১৬৯

দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায়

শব্দ মোহ বন্ধনে কবে প্রথম ধরা পড়েছিলুম আজ মনে নেই
কোনো এক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে জলস্রোতের পাশে
অকস্মাৎ দেখা যেন ঠিক আর এক স্রোত
সমস্ত ধ্বনির পাশাপাশি অন্য এক ধ্বনি
জীবন যাপনের পাশাপাশি এক অদেখা জীবন যাপন···
এক একদিন মনে হয়, প্রত্যেক পথেরই বুকের মধ্যে রয়েছে
দিক-হারাবার ব্যাকুলতা
চেনা বাড়ির রাস্তা দুঃখে কাতরায় নিরুদ্দেশের জন্য
প্রত্যেক স্বপ্নের ভিতরে আর একটি স্বপ্ন, তার ভিতরে, তার
ভিতরে, তার ভিতরে···

নৌকোর গলুইতে পা ঝুলিয়ে বসার মতন প্রিয়
বালাকাল ছেড়ে একদিন এসেছি কৈশোরে
বাবার হাত শক্ত করে চেয়ে ধরে নিজের চোখের চেয়েও
অনেক বড় চোখ মেলে
পা দিয়েছিলাম এই শহরের বাঁধানো রাস্তায়
ছোট ছোট স্টিমারের মতো ট্রাম, মুখ-না-চেনা এত মানুষ
আর এত সাইনবোর্ড, এত হরফ, দেয়ালের এত পোশাক, ভোরের
কুয়াশার মধ্যেও যেন সব কিছুর জ্যোতি ঠিকরে আসে
আমার চোখে
ঘোড়াগাড়ির জানলা দিয়ে দেখা মুহুর্মুহু ব্যাকুল উন্মোচন
কেউ জানে না আমি এসেছি, তবু চতুর্দিকে এত সমারোহ
মায়ের গা ঘেঁষে বসা উষ্ণ আসনটি থেকে যেন আমি ছিটকে
পড়ে যাবো বাইরে, বাবা হাত বাড়িয়ে দিলেন
বাঁক ঘোরবার মুখেই হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠলো, গুলাবি রেউড়ি, গুলাবি রেউড়ি
কেউ বললো, পাথরে নাম লেখাবেন, কেউ বললো, জয় হোক
তার সঙ্গে মিশে গেল হ্রেষা ও লৌহ শব্দ
সদ্য কাটা রক্তাক্ত মাংসের মতন টাটকা স্মৃতির সেই বয়েস···

তারপর
একদিন আমি নিজেই ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম বাবার হাত
বাবা আমাকে ধরতে এসেছেন,

আমি আড়ালে লুকিয়েছি
বাবা আমাকে রাস্তা চেনাতে গেলে
আমি ইচ্ছে করে গেছি ভুল রাস্তায়
তাঁর উৎকণ্ঠার সঙ্গে লুকোচরি খেলেছে আমার ভয় ভাঙা
তাঁর বাৎসল্যকে ঠকিয়েছে আমার সব অজানা অঙ্কুর
তিনি বারবার আমায় কঠিন শাস্তি দিলে আমি তাঁকে
শাস্তি দিয়েছি কঠিনতর
আমি অনেক দূরে সরে গেছি···

প্রথম প্রথম এই শহর আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল তার
শিহরন জাগানো গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
ছেলেভোলানো দৃশ্যের মতন আমি দেখেছিলাম রঙিন ময়দান
গঙ্গার ধারের বিখ্যাত সূর্যাস্তে দারুণ জমকালো সব
সারবন্দী জাহাজ
ইডেন বাগানে প্যাগোডার চূড়ায় ক্যালেণ্ডারে ছবির মতন রোদ
পরেশনাথ মন্দিরের দিঘিতে নিরামিষ মাছেদের খেলা
বাসের জানলায় কাঠের হাত, দোকানের কাচে সাজানো
কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের বই
প্রভাত ফেরীর সরল গান, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বাঁদরদের সঙ্গে পিকনিক
দু'মাসে একবার মামা-বাড়িতে বেড়াতে যাবার উৎসব···
ক্রমশ আমি নিজেই খুঁজে বার করি গোপন সব
ছোট ছোট নরক
কলাবাগান, গোয়াবাগান, পঞ্চাননতলা, রাজাবাজার
চিৎপুরের সুড়ঙ্গ, চীনে পাড়ার গোলোকধাম, সোনাগাছি, ওয়াটগঞ্জ, মেটেবুরুজ
একটু বেশি রাতে দেখা অজস্র ফুটপাথের সংসার
হাওড়া ব্রীজের ওপর দাঁড়ানো বলিষ্ঠ উলঙ্গ পাগলের
প্রাণখোলা বুককাঁপানো হাসি
চীনাবাদাম-ভাঙা গড়ের মাঠের গল্পের শেষে হঠাৎ কোনো
হিজড়ের অনুনয় করা কর্কশ কণ্ঠস্বর
আমায় তাড়া করে ফেরে বহুদিন
দশকর্ম ভাণ্ডারের পাশেগাড়িবারান্দার নীচে তিনটে কুকুর ছানার সঙ্গে
লাফালাফি করে একটি শিশু
কুকুরগুলোর চেয়ে শিশুটিই আগে দৌড়ে যায় ঝড়ের মতন লরির তলায়
সে তো যাবেই, যাবার জন্যই সে এসেছিল, আশ্চর্য কিছু না

কিন্তু পরের বছর তার মা অবিকল সেই শিশুটিকেই আবার
স্তন্য দেয় সেখানে
এইসব দেখে, শুনে, দৌড়িয়ে, জিরিয়ে
আমার কণ্ঠস্বর ভাঙে, হাফ প্যান্টের নীচে বেরিয়ে থাকে
এক জোড়া বিসদৃশ ঠ্যাঙ
গান্ধী হত্যার বিকট টেলিগ্রাম যখন কাঁপিয়ে দেয় পাড়া
তখন আমি বাটখারা নিয়ে পাশের বস্তির ছেলেদের সঙ্গে
ছিপি খেলছিলাম…

ভেবেছিলাম আসবো, দেখবো, বেড়াবো, ফিরে যাবো, আবার আসবো
ভেবেছিলাম দূরত্বের অপরিচয় ঘুচবে না কখনো
ভেবেছিলাম এই বিশাল মহান, গম্ভীর সুদূর শহর
গা ছমছমে অচেনা হয়েই থাকবে
জেলেরা যেমন সমুদ্রকে, শেরপারা যেমন পাহাড়কে, তেমন ভাবে
এই শহরকে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিতে চাইনি
এক সময় দুপুর ছিল দিকহীন চিলের ছায়ার সঙ্গে ছুটে যাওয়া
শৈশব মেশানো আলপথ, পুকুরের ধারে ঝুঁকে থাকা খেজুর গাছ
এক সময় ভোর ছিল শিউলির গন্ধ মাখা, চোখে স্থলপদ্মের স্নেহ
এক সময় বিকেল ছিল গাব গাছে লাল পিঁপড়ের কামড়
অথবা মন্দিরের দূরাগত টুংটাং
অথবা পাটক্ষেতে কচি অসভ্যতা
এক সময় সকাল ছিল নদীর ধারে স্কুল-নৌকোর প্রতীক্ষায়
বসে থাকা
অথবা জারুল বাগানে হঠাৎ ভয় দেখানো গোসাপের হাঁ
এক সময় সন্ধ্যা ছিল বাঁশ ঝাড়ে শাকচুন্নীদের
নাকিসুর শুনে আপ্রাণ দৌড়
অথবা বঞ্চিত রাজপুত্রদের কাহিনী
জামরুল গাছের নীচে
চিকন বৃষ্টিতে ভেজা
এক সময় রাত্রি ছিল প্রগাঢ় অকৃত্রিম নিস্তব্ধতা
মৃত্যুর কাছাকাছি ঘুম, অথবা প্রশান্ত মহাসমুদ্রে
আস্তে আস্তে ডুবে যাওয়া এক জাহাজ
গন্ধলেবুর বাগানে শিশিরপাতেরও কোনো শব্দ নেই
কোনো শব্দ নেই দিঘির জলে একা একা চাঁদের

অবিশ্রান্ত লুটোপুটির
চরাচর জুড়ে এক শান্ত ছবি, গ্রাম বাংলায়
মেয়েলি আমেজ মাখা সুখ
তার মধ্যে একদিন সব নৈঃশব্দ খান খান করে ভেঙে
সমস্ত সুখের নিলাম করা সুরে
জেগে উঠতো নিশির ডাক :
সস্তা না মূল ? সস্তা না মূল...

কৈশোর ভেঙেছে তার একমাত্র গোপন কার্নিস
কৈশোরই ভেঙেছে
ভেঙে গেছে যত ঢেউ ছিল দূর আকাশগঙ্গায়
শত টুকরো হয়ে গেছে সোনালী পীরিচ
সে ভেঙেছে, সে নিজে ভেঙেছে
পাথরকুচির আঠা দুই চোখে লেগেছিল তার
রক্ত ঝরে পড়েছিল হাতে
তবুও সমস্ত সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে এসে
পা সেঁকে নিয়েছে গাঢ় আগুনের আঁচে
কৈশোর ভেঙেছে সব ফেরার নিয়ম
যে-রকম জলস্তম্ভ ভাঙে
কৈশোর ভেঙেছে তার নীল মখমলে ঢাকা অতিপ্রিয় পুতুলের দেশ
সে ভেঙেছে অনুপম তাঁত
চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চুন, সুরকি, ধুলো
মৃত পাখিদের কলকণ্ঠস্বর উড়ে গেছে হাওয়ার ঝাপটে
যেখানে বরফ ছিল সেখানেই জ্বলছে মশাল
যেখানে কুহক ছিল সেখানে কান্নার শুকনো দাগ
এখনো স্নেহের পাশে লেগে আছে ক্ষীণ অভিমান
আয়নায় যাকে দেখা, তাকেই সে ভেঙেছিল বেশি
কৈশোর ভেঙেছে সব, কৈশোরই ভেঙেছে
যখন সবাই তাকে সমস্বরে বলে উঠেছিল, মা নিষাদ
সেইক্ষণে সে ভেঙেছে, তার নিজ হাতে গড়া ঈশ্বরের মুখ
আমরা যারা এই শহরে হুড়মুড় করে বেড়ে উঠেছি
আমরা যারা ইট চাপা হলুদ ঘাসের মতন একদিন ইট ঠেলে
মাথা তুলেছি আকাশের দিকে
আমরা যারা চৌকোকে করেছি গোল আর গোলকে করেছি জলের মতন

সমতল

আমরা যারা রোদ্দুর মিশিয়েছি জ্যোৎস্নায় আর
নদীর কাছে বসে থেকেছি গাঢ় তমসায়
আমরা যারা চালের বদলে খেয়েছি কাঁকর, চিনির বদলে কাচ
আর তেলের বদলে শিয়ালকাঁটা
আমরা যারা রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা
মৃতদেহগুলিকে দেখেছি
আস্তে আস্তে উঠে বসতে
আমরা যারা লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও গুলির মাঝখান দিয়ে
ছুটে গেছি এঁকেবেঁকে
আমরা যারা হৃদয়ে ও জঠরে জ্বালিয়েছি আগুন
সেই আমরাই এক একদিন ইতিহাস-বিস্মৃত সন্ধ্যায়
আচমকা হুল্লোড়ে বলে উঠেছি, আঃ,
বেঁচে থাকা কি সুন্দর !
আমরা ধূসরকে বলেছি রক্তিম হতে, হেমন্তের আকাশে
এনেছি বিদ্যুৎ
আমরা ঠনঠননের রাস্তায় হাঁটু-সমান জল ভেঙে ভেঙে
পৌঁছে গেছি স্বর্গের দরজায়
আমরা নাচের তাণ্ডব তুলে ভাঙিয়ে ডেকে তুলেছি মধ্যরাত্রিকে
আমরা নিঃসঙ্গ কুষ্ঠরোগীকে, পথভ্রান্ত জন্মান্ধকে, হাড়কাটার
বাতিল বেশ্যাকে বলেছি, বেঁচে থাকো
বেঁচে থাকো
হে ধর্মঘটী, হে অনশনী, হে চণ্ডাল, হে কবরখানার ফুলচোর
বেঁচে থাকো
হে সন্তানহীনা ধাইমা, তুমিও বেঁচে থাকো, হে ব্যর্থ কবি, তুমিও
বাঁচো, বাঁচো, হে আতুর, হে বিরহী, হে আগুনে পোড়া সর্বস্বান্ত, বাঁচো
বাঁচো জেলখানায় তোমরা সবাই, বাঁচো হাসপাতালে তোমরা
বাঁচো, বাঁচো, বেঁচে থাকো, উড়তে থাক নিশান, জ্বলুক বাতিস্তম্ভ
হাড় পাঁজরায় লেপটে থাক শেষ মুহূর্ত
ভূমিকম্প অথবা বজ্রপাতের মতন আমরা তুলেছি বেঁচে থাকার তুমুল হুঙ্কার
ধ্বংসের নেশায়, ধ্বংসকে ভালোবেসে আমরা চেয়েছি জন্মজয়ের প্রবল
উত্থান।

যারা অপমান দিয়ে চকিতে মিলিয়ে গেছে পথের বাঁকে, তারা
হয়তো ভুলে গেছে, আমি ভুলিনি
স্মৃতির মধ্যে ঢুকেছিল বীজ, একদিন তা মহীরুহ হয়েছে
সমস্ত গভীরতার চেয়ে গভীর পাতালতম প্রদেশে তার শিকড়
সমস্ত উচ্চতার চেয়ে উঁচুতে অভ্রংলিহ তার শিখর
তার হিরণ্য ডালপালায় বসেছে এক পাখি যার হীরে কুচি চোখ
বহুদিনের অতীত ভেদ করে সে বলেছে, প্রতীক্ষায় আছি
আমার সারা শরীরে ঝাঁকুনি লাগে, কার জন্য প্রতীক্ষা ?
কিসের জন্য প্রতীক্ষা ?
আমি বিহ্বল হয়ে আকাশের দিকে তাকাই, আকাশকে মনে হয়
বারুদখানা
আমি বৃষ্টির মধ্যে সরু হয়ে হেঁটে যাই, বৃষ্টিকে মনে হয়
তেজস্ক্রিয়
আমি জানলার গরাদের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার প্রাণ-প্রতিমাকে
প্রশ্ন করি, জানো, কার জন্য প্রতীক্ষা ?
কিসের প্রতীক্ষা ?
এ তো প্রতিশোধ নয়, প্রতিশোধের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক মনোরাজ্য
যার কামারশালায় বিচ্ছুরিত শব্দের ফুলকি সর্বক্ষণ
ঘিরে রাখে আমার
একলা সময়
আসলে আমার একাকিত্ব নেই, আমার নির্জনতা নেই, মুক্তি নেই
এক একদিন এই শহর স্তব্ধ হয়ে যায়
এক একদিন এই চোখে দেখা জগতে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়
সমস্ত জনপ্রাণী
সেই মাতৃগর্ভের মতন নিবাত নিষ্কম্প অস্তিত্বের মধ্যেও
জেগে থাকে আদিম শব্দ
সমস্ত জাগরণের পাশে সেই এক মহা জাগরণ
সমস্ত ধ্বনির চেয়ে সেই এক আলাদা ধ্বনি
তখন সমস্ত অন্ধকারের পাশে এসে দাঁড়ায়
এক অন্য অন্ধকার
স্পষ্ট চেনা যায় এক একবার, আবার চেনা যায় না
গভীর অতলের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে হঠাৎ আঁকড়ে ধরি
ভাসমান তৃণ
এই নিমজ্জন ও ভেসে ওঠা, বারবার, যেন শরীরের মধ্যেই

শরীরকে খোঁজাখুঁজি

যেমন নারীর ভিতরে নারীকে, তার ভিতরে এক অন্য নারী, যেমন
স্তন ও কোমরের খাঁজে অন্য এক
রূপের চোখ ফাটানো বিভা,
তার ভিতরে অন্য এক, তার
ভিতরে, তার ভিতরে,
যেমন স্বপ্নের মধ্যে
স্বপ্ন...

এমনকি যেখানে সুন্দর অতি প্রথাসিদ্ধ, অরণ্যে বা পাহাড় চূড়ায়
যেখানে মেঘ ও রৌদ্রের খেলায় মেতে থাকে মেঘ ও রৌদ্রের প্রভুরা
সেখানে সমস্ত আলোর পাশে উড়তে থাকে আরও একটি আলোর পর্দা
সমস্ত বৃক্ষের মাথা ছাড়িয়ে উঠে আসে আর একটি বৃক্ষ, তার
হিরণ্য ডালপালা নিয়ে
সেখানে বসে থাকে একটি পাখি, যার হীরে কুচি চোখ
অচেনাতম কণ্ঠস্বরে সে বলে ওঠে, মনে আছে ? প্রতীক্ষায় আছি !
তখনই শৃঙ্খলের মতন ঝনঝনিয়ে ওঠে নাদব্রহ্ম, তখনই
ছ' নম্বরের দিকে ব্যাকুলভাবে চায় পাঁচটি ইন্দ্রিয়
কার প্রতীক্ষা ? কিসের জন্য প্রতীক্ষা ? উত্তর পাই না
যদিও জানি, এই নীলিমার পরপারে নেই আর অন্য নীলিমা
মৃত্যুর ওপারে জীবন !

ছায়ার ভিতর থেকে বের হয়ে আসে ছায়া, সমান দূরত্ব রেখে
যমজের মতো ছুটে যায়
অথবা হ্রদের পাশে খুব শান্তভাবে বসে থাকা, যেন দু'রকম জলের কিনারে
দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়, দেখা হলো, দেখা হলো
রোদ্দুরের মধ্যে ওড়ে কার্পাস তুলোর বীজ,
এত মায়া, এত বেশি মায়া
সব কিছু এক জীবনের নর্ম সহচর, দেখা হলো, আরক্ত সন্ধ্যায়
দেখা হলো
দেখা হলো নারী ও নৈরাজ্য, কয়েক ফোঁটা ছন্নছাড়া কান্না বিন্দু
পড়ে রইলো ঘাসে
এদিকে ওদিকে জাগে আকস্মিক হাতছানি, যে-কোনো নদীর বাঁকে
চোখের ইশারা

দেখা হলো, পাথরের বুকে ঘুম, নদীর দর্পণে লুপ্ত সভ্যতার সঙ্গে
দেখা হলো
জননী-চুম্বক ছেড়ে আরও দূরে দেখা হলো নিভৃত শিল্পের বড়
মর্মভেদী টান
দেখা হলো, দেখা হলো, দেখা…

কবিতা লেখার চেয়ে

কবিতা লেখার চেয়ে কবিতা লিখবো এই ভাবনা
আরও প্রিয় লাগে
ভোর থেকে টুকটাক কাজ সারি, যে ঘর ফাঁকা করে
সময়ে সুগন্ধ দিয়ে তৈরি হতে হবে
দরজায় পাহারা দেবে নিস্তব্ধতা, আকাশকে দিতে হবে
নারীর উরুর মসৃণতা, তারপর লেখা
হীরক-দ্যুতির মতো টেবিল আচ্ছন্ন করে বসে থাকে
কালো রং কবিতার খাতা
আমি শিস দিই, সিগারেট ঠোঁটে, দেশলাই খুঁজি
মনে ফুরফুরে হাওয়া, এবার কবিতা, একটি নতুন কবিতা…
তবু আমি কিছুই লিখি না
কলম গড়িয়ে যায়, ঝুপ করে শুয়ে পড়ি, প্রিয় চোখে
দেখি সাদা দেয়ালকে, কবিতার সুখস্বপ্ন
গাঢ় হয়ে আসে, মনে মনে বলি, লিখবো
লিখবো এত ব্যস্ততা কিসের
কেউ লেখা চাইলে বলি, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, কাল দেবো, কাল দেবো
কাল ছোটে পরশু কিংবা তরশু কিংবা পরবর্তী সোমবারের দিকে
কেউ কেউ বাঁকা সুরে বলে ওঠে, আজকাল গল্প উপন্যাস
এত লিখছেন
কবিতা লেখার জন্য সময়ই পান না
বুঝি ? না ?
উত্তর না দিয়ে আমি জনান্তিকে মুখ মুচকে হাসি
ফাঁকা ঘরে, জানালার ওপারে দূর
নীলাকাশ থেকে আসে
প্রিয়তম হাওয়া

না-লেখা কবিতাগুলি আমার সর্বাঙ্গ
জড়িয়ে আদর করে, চলে যায়, ঘুরে ফিরে আসে
না হয়ে ওঠার চেয়ে, আধো ফোটা, ওরা খুনসুটি
খুব ভালোবাসে।

কথা ছিল না

টিলার মতন উঁচু বাড়ির শিখরতলায়
আমার বসতি হবার কথা ছিল না
আমার কথা ছিল না সংবাদপত্র অফিসের ঠাণ্ডা ঘরে
চোখ গরম মানুষের ভিড়ে বসে থাকার
রাস্তায় চলতে চলতে কেউ আমার মুখের সামনে হঠাৎ
চট করে একটা আয়না তুলে ধরলে
আমি চমকে উঠি, ভয় পাই, এ কে ?
এমন গাম্ভীর্য, এমন ভুরুর ভাঁজ, কথা ছিল না,
কথা ছিল না !

হে জীবন, হে নদীতীরে গাছের তলায় শুয়ে থাকা জীবন,
হে জীবন, হে মেষপালকের সঙ্গীর অলস বাঁশীর সুরের জীবন,
হে দিনযাপন, হে সন্ধ্যার শ্মশানতলায় বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড়,
হে অভিমান, হে চোখাচোখির নীরবতা—
হে চিঠি না পাওয়ার দুঃখ, হে শেষ রাত্রির গান,
হে সুন্দর, হে প্রথম নীরাকে ছোঁয়ার হৃৎস্পন্দন,
হে অলস দুপুরের নিঃসঙ্গতা,
তোমরা আমায় ভুলে গেলে ?
এ কোন্ কঠোর কপিশ জীবনে দিলে আমায় নির্বাসন !
হে ভূমধ্য সাগরের ভাসমান নাবিক, একটু থামো,
আমিও তোমার পাশে, একটু জায়গা দাও, তুলে নেব দাঁড়।

দুর্বোধ্য

মাত্র বারো তেরো বছর বয়েস ছেলেটার, বললো, ওর মা, বাবা
কেউ নেই। অথচ আমার আছে, আমি তো এই দুঃখ পাইনি,
মনে হলো, হয়তো কোনো ভাবে আমি ওকে বঞ্চনা করেছি।

কোথায় থাকিস ? জিজ্ঞেস করলাম ছেলেটিকে, সে বললো,
কোথাও না। কথা বলার সময় সে ঝকঝকে ভাবে হাসে।
পাশের একজন লোক বললো, ওর আবার থাকা না-থাকা
ও ছোঁড়া তো বারো হাটের কানাকড়ি !

এ তো নতুন কিছু খবর নয়, আকাশের নীচে কিংবা
গাছ পালার মৃদু প্রশ্রয়ে এখনো রয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। আমি
থাকি রীতিমত সৌখিন বাড়িতে, গৃহহীনদের কথা চিন্তা করে
আমার গৃহত্যাগ করার কোনো মানে আছে কি ?

চায়ের দোকানের দাম মিটিয়ে আমরা উঠে পড়লুম।
তারপর গাড়ি চললো দুর্দান্ত গতিতে, দু'পাশে
সজল সুন্দর প্রকৃতি, গ্রাম বাংলার বিখ্যাত সৌন্দর্য, এ সব
দেখে চোখ না-জুড়োনো অন্যায়।

তবু বারবার মাথার মধ্যে গুঞ্জরিত হয় এক প্রশ্ন ও
উত্তর :
তুই কোথায় থাকিস ?
কোথাও না !
কিন্তু একথা বলার সময়ও ছেলেটি হেসেছিল কেন ?

দীর্ঘ কবিতাটির খসড়া

এই পৃথিবীর সঙ্গে একটা আলাদা পৃথিবী মিশে রয়েছে
অরণ্যের সঙ্গে এক সমান্তরাল অরণ্য
দুপুরের নির্জনতার মধ্যে অন্য এক নির্জনতা
আমাকে চমকে দেয়, এক এক সময় দারুণ চমকে দেয়

ভালোবাসার মুখমণ্ডল ঘিরে আছে অন্য এক ভালোবাসা
দীর্ঘশ্বাসের পাশে এক দীর্ঘশ্বাস
কোনো দিন একলা বিকেল বেলা গিয়ে দিঘির পাড়ে বসি,
তরঙ্গে তরঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় রক্তবর্ণ আকাশ
তখনো ঠিক আর একটি দিঘির পাশে অসংখ্য তরঙ্গের
সম্রাট হয়ে একজন একলা মানুষের বসে থাকা—
একজন একলা মানুষ, জলের ইন্দ্রজালে সে দেখে সে একা নয়
সব দুঃখের হিম ঠাণ্ডা বিছানায় রয়েছে
আর একটি দ্বিতীয় দুঃখ
সমস্ত মসৃণ রাস্তার শিয়রে লক লক করে
আর এক ভুলে যাওয়া নিরুদ্দেশের পথ
আমাকে চমকে দেয়, এক এক সময় দারুণ চমকে দেয়…

এই জীবন

বাঁচতে হবে বাঁচার মতন, বাঁচতে বাঁচতে
এই জীবনটা গোটা একটা জীবন হয়ে
জীবন্ত হোক

আমি কিছুই ছাড়বো না, এই রোদ ও বৃষ্টি
আমাকে দাও ক্ষুধার অন্ন
শুধু যা নয় নিছক অন্ন
আমার চাই সব লাবণ্য

নইলে গোটা দুনিয়া খাবো !
আমাকে কেউ গ্রামে গঞ্জে ভিখারী করে
পালিয়ে যাবে ?
আমায় কেউ নিলাম করবে সুতো কলে,
কামারশালায় ?
আমি কিছুই ছাড়বো না আর, এখন আমার
অন্য খেলা
পদ্মপাতায় ফড়িং যেমন আপনমনে খেলায় মাতে
গোটা জীবন

মানুষ সেজে আসা হলো,
মানুষ হয়েই ফিরে যাবো
বাঁচতে হবে বাঁচার মতন, বাঁচতে বাঁচতে
এই জীবনটা গোটা একটা জীবন হয়ে
জীবন্ত হোক !

নিজের কানে কানে

এক এক সময় মনে হয়, বেঁচে থেকে আর লাভ নেই
এক এক সময় মনে হয়
পৃথিবীটাকে দেখে যাবো শেষ পর্যন্ত !
এক এক সময় মানুষের ওপর রেগে উঠি
অথচ ভালোবাসা তো কারুকে দিতে হবে
জন্তু-জানোয়ার গাছপালাদের আমি ওসব
দিতে পারি না
এক এক সময় ইচ্ছে হয়
সব কিছু ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করে ফেলি
আবার কোনো বিরল মুহূর্তে
ইচ্ছে হয় কিছু একটা তৈরি করে গেলে মন্দ হয় না ।
হঠাৎ কখনো দেখতে পাই সহস্র চোখ মেলে
তাকিয়ে আছে সুন্দর
কেউ যেন ডেকে বলছে, এসো, এসো,
কতক্ষণ ধরে বসে আছি তোমার জন্য
মনে পড়ে বন্ধুদের মুখ, যারা শত্রু হতেও তো পারতো
মনে পড়ে হালকা শত্রুদের, যারাও হয়তো কখনো
আবার বন্ধু হবে
নদীর কিনারে গিয়ে মনে পড়ে নদীর চেয়েও উত্তাল সুগভীর নারীকে
সন্ধের আকাশ কী অকপট, বাতাসে কোনো মিথ্যে নেই,
তখন খুব আস্তে, ফিসফিস করে, প্রায়
নিজেরই কানে কানে বলি,
একটা মানুষ-জন্ম পাওয়া গেল, নেহাৎ অ-জটিল কাটলো না !

দুঃখ

এক সময় দুঃখের কথা দুঃখের সুরে বলতাম
তখন দুঃখকে চিনতাম না
কিংবা দুঃখ ছিল না তখন, আকস্মিক
বৃষ্টিতে দুলতো বিষাদের পাতলা পর্দা
পৌনে তিনশো মাইল দূরে ছুটে গেছে দীর্ঘশ্বাস
অসংখ্য নীলখাম জঠরে নিয়ে গেছে
দুপুরবেলার অভিমান
ছেঁড়া চটি পায়ে দিন রাত ঘুরে ঘুরে
সঙ্গে বহন করতাম খালি পকেটের মতন
খুনখারাপ
হিরণ্ময় ভোরবেলাগুলির গায়ে লেগে থাকতো
হৃদয়-শোণিত
সুখী ছিলাম, সুখী ছিলাম, ভীষণ সুখী ছিলাম না ?

এখন কেউ এসে আমাকে দেখুক
আমার পরিচ্ছন্ন মুখ, আমার মসৃণ জীবন যাপন
চায়ের কাপের পাশে সিগারেট সমৃদ্ধ হাত
নিশীথ যবনিকা তছনছ করা সৌখিন দাপাদাপি
যে-কেউ দেখে ভাববে, আমি দুঃখকে চিনিই না ।

দ্বিখণ্ডিত

লঙ্গরখানায় একবার আমি তুলে নিই পরিবেশনের হাতা
পরেরবার আমিও বসে পড়ি ওদের সঙ্গে
আমিই ভিখারী ও অন্নদাতা
আমিই বহিরাগত ও মাটির মানুষ
পদ্মপাতায় গরম গরম খিচুড়ি, আমার পেটে জ্বলছে বহুকালের খিদে
মাথার ওপরে হিঙ্গলগঞ্জের বিষণ্ণ মেঘলা আকাশ
আমার ডান হাত ও বাঁ হাত দুটিই ব্যস্ত
খাওয়া ও মাছি তাড়ানোয়
তৃতীয় হাতা খিচুড়ির জন্য আমার জিভে জল পড়ে

এর আগে আমি নিজেই দু'হাতার বেশী কারুকে দিইনি
আমি ভিখারীগুলির উওদ্দশ্যে বলি, এই চোপ্, চোপ !
পরমুহূর্তেই স্বেচ্ছাসেবীদের বলি, শালা !
তারপর বাতাস, আঁশটে গন্ধ ও দিগন্তবিস্তৃত জলের
কিনারায় দাঁড়িয়ে
আমি মনুষ্যজন্ম শেষ করে অদৃশ্য হয়ে যেতে চাই।

ইচ্ছে হয়

এমনভাবে হারিয়ে যাওয়া সহজ নাকি
ভিড়ের মধ্যে ভিখারী হয়ে মিশে যাওয়া ?
এমনভাবে ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গ থেকে ধুলোর মর্ত্যে
মানুষ সেজে একজীবন মানুষ নামে বেঁচে থাকা ?
রূপের মধ্যে মানুষ আছে, এই জেনে কি নারীর কাছে
রঙের ধাঁধাঁ খুঁজতে খুঁজতে টনটনায় চক্ষু স্নায়ু।
কপালে দুই ভুরুর সন্ধি, তার ভিতরে ইচ্ছে বন্দী
আমার আয়ু, আমার ফুল ছেঁড়ার নেশা
নদীর জল সাগরে যায়, সাগর জল আকাশে মেশে
আমার খুব ইচ্ছে হয় ভালোবাসার
মুঠোয় ফেরা !

কথা আছে

বহুক্ষণ মুখোমুখি চুপচাপ, একবার চোখ তুলে সেতু
আবার আলাদা দৃষ্টি, টেবিলে রয়েছে শুয়ে
পুরনো পত্রিকা
প্যান্টের নীচে চটি, ওপাশে শাড়ির পাড়ে
দুটি পা-ই ঢাকা
এপাশে বোতাম খোলা বুক, একদিন না-কামানো দাড়ি
ওপাশের এলো খোঁপা, ব্লাউজের নীচে কিছু
মসৃণ নগ্নতা
বাইরে পায়ের শব্দ, দূরে কাছে কারা যায়

কারা ফিরে আসে
বাতাস আসেনি আজ, রোদ গেছে বিদেশ ভ্রমণে।

আপাতত প্রকৃতির অনুকারী ওরা দুই মানুষ-মানুষী
দু'খানি চেয়ারে স্তব্ধ, একজন জ্বালে সিগারেট
অন্যজন ঠোঁট থেকে হাসিটুকু মুছেও মোছে না
আঙুলে চিকচিকে আংটি, চুলের একটু ঘাম
ফের চোখ তুলে কিছু স্তব্ধতার বিনিময়,
সময় ভিখারী হয়ে ঘোরে
অথচ সময়ই জানে, কথা আছে, ঢের কথা আছে।

নেই

খড়ের চালায় লাউ ডগা, ওতে কার প্রিয় সাধ লেগে আছে
জলের অনেক নীচে তুলসীমঞ্চ, সেইখানে ছোঁয়া ছিল অনেক প্রণাম
রান্নাঘরটিতে ছিল কিছু ক্ষুধা, কিছু স্নেহ, কিছু দুর্দিনের খুদকুঁড়ো
উঠোনে কয়েকটি পায়ে দাপাদাপি, দু'খুঁটিতে টান করা ছেঁড়া ডুরে শাড়ি
পাশেই গোয়ালঘর, ঠিক ঠাকুমার মতো সহ্যশীলা নীরব গাভীটি
তাকে ছায়া দিত এক প্রাচীন জামরুল বৃক্ষ, যার ফল খেয়ে যেত পোকা
পটের ছবির মতো চুরি করা মাছ মুখে বিড়ালের পালানো দুপুর
সবই যেন দেখা যায়, অথচ কিছুই নেই, চতুর্দিকে জলের কল্লোল
এখন রাত্রির মতো দিন আর রাতগুলি আরও বেশি অতিকায় রাত
জননী মাটির কাছে মানুষের বুক ছিল, মাটিকে ভাসিয়ে গেছে মাটির দেবতা।

যাত্রাপথ

একটু আধটু বিপদ ছিল পথের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো
তার মধ্যে যাত্রা এবং দুই আঙুলে অনেক দিনের ব্যথা
পকেট ভরা নাম ঠিকানা, এবং তারা সবাই নির্বাসিত
তবু কোথাও যেতে হবে, বেলা শেষের আগেই যাওয়ার কথা।

যেদিন খুব তাড়া আমার, সেদিনই সব হুড়মুড়িয়ে নামে

অকাল মেঘ চমকে দেয় সারা আকাশ, বৃষ্টি আসে হামলে
সামনে হঠাৎ গজিয়ে উঠলো পাহাড়, নাকি ভুঁইফোঁড় গাছপালা
চতুর্দিকে শিসের শব্দ, চতুর্দিকে ভয়ের শব্দ, অশরীরীর শ্বাস।

এই রকম হবার কথা, কোনোদিনই তো ঠিক পথ বাছিনি
যে-জল আমার বিষম চেনা, ডুব দিইনি কখনো সেই জলে
যেমনভাবে হারিয়ে যাবার কথা ছিল, তেমনভাবে হারানোও তো হলো না
বিশ্বাসের কষ্ট ছিল, ভালোবাসার ভুল ছিল কি ? সব কিছু তাই
ধরা ছোঁয়ার বাইরে ?

ছিল না কৈশোর

আমার প্রকৃতি প্রেম খুব-একটা ছিল না কৈশোরে
বসেছি নদীর ধারে, নদীকে দেখিনি, ছিল
ওপারে যাবার ছটফটানি
জীবনে দু'তিনবার, মাত্রই দু'তিনবার হেঁটে গেছি
বুক ভরা আকাশের নীচে
আমার ছিল না দুই সীমানা-পেরুনো লঘু লোভ
আমার গোপন
আমার দুঃখেরা ছিল দীন দুঃখী, অন্ধকারে, ছিল ওরা
ইঁট চাপা ঘাসের মতন কিছু বন্ধ অন্ধকারে
বনমর্মরের শব্দ ছাপিয়ে তুলেছি আমি উল্লাসের ভাঙা গানে
গানেরও ওপরে তুলে এই হেঁড়ে গলা।

আজ বহু দূরে এসে, কংক্রীট ছাদের নীচে,
সামনে খোলা কবিতার খাতা
আমি সেই কিশোরকে ফের দেখি, বসে আছে
নদীর ঢালুতে
আমি দেখি নদীটির পাশ ফেরা, দুপুরের বর্ণ-দ্যুতি
বাতাস দ্বিখণ্ড ক'রে ডেকে ওঠে চিল
একটু একটু মন-খারাপ, কবিতার খাতা মুড়ে উঠে আসি
বারান্দায়, চুপ

আকাশ অচেনা লাগে, মায়াময় গাঢ় চোখে মনে হয়
দিগন্তও খুব কাছে এগিয়ে এসেছে।

সেই লেখাটা

সেই লেখাটা লিখতে হবে, যে লেখাটা লেখা হয়নি
এর মধ্যে চলছে কত রকম লেখালেখি
এর মধ্যে চলছে হাজার হাজার কাটাকুটি
এর মধ্যে ব্যস্ততা, এর মধ্যে হুড়োহুড়ি
এর মধ্যে শুধু কথা রাখা আর কথা ভাঙা
শুধু অন্যের কাছে, শুধু ভদ্রতার কাছে, শুধু দীনতার কাছে
কত জায়গায় ফিরে আসবো বলে আর ফেরা হয়নি
অর্ধ সমাপ্ত গানের ওপর এলিয়ে পড়েছিল ঘুম
মেলায় যে উষ্ণতা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলাম
শোধ দেওয়া হয়নি সে ঋণ
এর মধ্যে চলেছে প্রতিদিন জেগে ওঠা ও জাগরণ থেকে ছুটি
এর মধ্যে চলছে আড়চোখে মানুষের মুখ দেখাদেখি
এর মধ্যে চলছে স্রোতের বিপরীত দিক ভেবে স্রোতেই ভেসে যাওয়া
শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা আর অপেক্ষা
ব্যস্ততম মুহূর্তের মধ্যেও একটা ঝড়ে-ওড়া শুকনো পাতা
শুধু অপেক্ষা
সেই লেখাটা লিখতে হবে, যে লেখাটা লেখা হয়নি !

একটা মাত্র জীবন

একটা মাত্র জীবন তার হাজার রকম দুনিয়াদারি
এক জীবনে চক মেলানো উল্টো সোজা দিলাম পাড়ি
পায়ের তলায় মায়া সর্ষে, পায়ের তলায় ঝড়ের হাওয়া
ফুলঝরানো দিনের শেষে ফুল-বিলাসী কুহক পাওয়া
একটা মাত্র জীবন তার হাজার রকম দুনিয়াদারি !

স্বপ্নে আমার জীবনটাকে বদলেছিলাম সহস্রবার
স্বপ্ন ভাঙা অন্যজীবন ভাঙলো কত বন্ধ দুয়ার

এদিক ওদিক তাকাই আমার কূল মেলে না দিক মেলে না
খরচ হলো এক আধুলি খাতায় লেখা রাজ্য দেনা
একটা মাত্র জীবন তার হাজার রকম দুনিয়াদারি !

যা চেয়েছি

একটুখানি মৃত্যু দেবে
কিছুক্ষণের ভীষণ রকম মরণ ?
স্কুল পালানো ছেলের মতন
ছুটতে ছুটতে তোমার কাছে
পিছন পিছন ভয় খাওয়ানো হাওয়া
সমস্তক্ষণ বাঁচতে বাঁচতে
ভিড়ের মধ্যে বাঁচতে বাঁচতে
বাঁচা আমার ধোপা বাড়ির কাপড়
আর সকলে বেঁচে বর্তে
ধুলোর মর্ত্যে খেলা করুক
শুনুক সোনা-রুপোর ঝনঝনানি
আমার চাই অবগাহন
এক নিমেষে হারিয়ে যাওয়া
যেমন কোনো দৃষ্টিহীনের স্বপ্ন
নীরব ঘর, সুখ চাহনি
বাহুর ঘেরে আলোকলতা
আর কিছু না, আমার বেশি চাই না
চাই না প্রেম স্নেহ মমতা
সার্থকতা এক জীবনের
শুধু মৃত্যু অমর ভাবে মরণ !

কবির মিনতি

কাঠগুদামের পাশে এক টুকরো প'ড়ো জমি
দুটি দুঃখী প্রাণ সেইখানে বসেছিল সন্ধেবেলা
একটু পরেই ওরা মিশে যাবে মলিন বাতাসে ।

যেমন শালিক পাখি খানিকটা শব্দ রেখে যায়
যেমন সোনালি সাপ ঘাসের গোড়ায় ঢালে বিষ
সে রকমই ও দু'জন ওখানে কি একটুখানি দুঃখ ফেলে গেল ?

যেন যায়, তাই যেন যায় !

আকাশের ছলনার সীমা নেই, মেঘগুলি মোহের প্রাচীর
বাতাস সহস্রবার উল্টে দেয় লঘু ইতিহাস
এমন কি কাঁটা ঝোপ, আগাছারও নেই কিছু মায়া ?
তোমাদের কাছে এই কবির মিনতি, কেড়ে নাও
ওদের কিছুটা দুঃখ ভুলিয়ে ভালিয়ে কেড়ে নাও
ভুলে ফেলে যাওয়া কোনো রুমালের মতো এক টুকরো দুঃখ
যেন কাঠগুদামের পাশে পড়ে থাকে ।

নদীর ধারে

নদীপ্রান্তে বসে আছে এক উন্মাদ, আমি প্রথমে তাকে কবি ভেবেছিলাম ।
বস্তুত তাকে দার্শনিকও বলা যাবে, না কেন না সে জানে না চশমা
বদলাতে । নদীর সঙ্গীত বা সূর্যাস্তের চিত্র প্রশনীতেও তার চোখ কান
নেই, সে তার লম্বা আঙুলে চুলেখ জট ছাড়াচ্ছিল । নদীপ্রান্তের সেই
উন্মাদকে নদীর ধারের পাগলাও বলা যায়, সে এমন উলঙ্গ
কিংবা ন্যাংটো । কিছুতেই তাকে কবি বলা যাবে না, কারণ তার
একাকিত্ব বোধ নেই, সে প্রেমিক নয়, কারণ সে জানে না
আত্মরতি, সে নিতান্তই একটা পাগলা, সে নদীকে লাথি
মারছিল । নদী তাকে ভয় দেখাবার জন্য ফুলে ফেঁপে উঠলো,
দিগন্ত কাঁপিয়ে হা-হা শব্দ, চতুর্দিকে ক্রুদ্ধ তোলপাড়, আকাশ
নিচু হয়ে এলো, তবু সেই একলা পাগল নদীকে লাথির পর
লাথি মেরে যায় । তারপর তার মাথার ওপরে ঘোর
বজ্র গর্জন হতেই হাত তুলে সে জমিদারি গলায় বলে ওঠে, আবার !

গোল্লাছুট

মানুষ হলো সংখ্যা, আর সংখ্যার তো মন থাকে না !
কত মানুষ এলো, এবার কত মানুষ গেল ?
তিন কিংবা তিনশো কিংবা পঁচিশ তিরিশ হাজার
শূন্য, শূন্য
ট্রেন লাইনের দু'পাশ জুড়ে পড়ে রইলো
মানুষ নয়, শূন্য, শূন্য, শূন্য
জলে কাদায় খাঁ খাঁ রোদে সংখ্যাগুলো
উল্টে পাল্টে শোয়, শুয়েই থাকে
আবার ঝড়ের ঝাপটা লাগে
ধুলো বালির মতোই
ভাসে হাওয়ায়
কত মানুষ এলো, এবার কত মানুষ গেল ?
গাছের ডালে কে ঝুললো, গাছ কেটে কে
বানালো তার বসত্
নদীর জলে ভাসলো শব, আবার কেউ
সাঁতরে গেল ওপার
কে কে গেল, ক'জন গেল, কারা ভেড়ার পালের মতন
বাঁশী শুনে পেছন ফিরলো
একটি ভেড়া, তিনটি ভেড়া, তিনশো ভেড়া,
একটি মানুষ, তিনটি মানুষ, তিনশো মানুষ
তিরিশ কিংবা পঞ্চাশ হাজার, লক্ষ মানুষ নাম থাকে না
শূন্য নিয়ে গোল্লাছুট খেলার মতন
ক'জন রইলো, ক'জন ফিরলো
নাম থাকে না, এসব খেলায় নাম থাকে না,
নাম থাকে না ।

সেদিন

বিশ্বাসই হয় না যেন এতদিন কেটে গেছে,
এই তো সেদিন দেখা হলো
মোড়ের দোকানে এসে দুটি সিগারেট ধার হলো

মনে নেই ?
বৃষ্টি ভেজা হাঁটা পথ, চতুর্দিকে কত চেনা বাড়ি
যখন যেখানে খুশি যাওয়া যায়, বাদলের ছোড়দিকে
শার্ট খুলে অনায়াসে বলা যায়, একটা বোতাম একটু
লাগিয়ে দিন না
এই তো সেদিন মাত্র দুপুরে জিনের পাঁট হাতে নিয়ে
অকস্মাৎ শক্তি উপস্থিত
চোখ টিপে বলে উঠলো, অফিসের বেয়ারাকে
দিতে বলে দুটো খুব ছোট ছোট গ্লাস
চায়ের দোকানে বসে প্রণবেন্দু বলে যেত
কাটলেট সহযোগে নতুন কবিতা
যেন ঠিক গতকাল, বন্ধুদের পাশ ছেড়ে কোনো কোনো দিন
নিঃশব্দে পালাতাম মানিকতলায়
এবং এক পা তুলে ফুটপাথে প্রতীক্ষায় কেটে যেত
দণ্ড, পল, অনেক প্রহর
গানের ইস্কুল থেকে যদি কেউ আসে, যদি
একবার চোখ তুলে দেখে
আজও যেন রয়ে গেছি প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায়
যদি দেখা হয় ।

হে পিঙ্গল অশ্বারোহী

হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো
ঐ দ্যাখো থেমেছে সময়
দিগন্তের কিছুটা ওপারে
থেমে গেল বারুদের ঝড়
আকাশ একাকী ছিল চাঁদ
তাকে খেল পাহাড়ী ভল্লুকে
হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো
চেয়ে দ্যাখো তোমার দক্ষিণে
লাফ দিয়ে উঠেছে শূন্যতা
পাহাড়ের মতো সে বিশাল
বাঘের থাবার মতো ক্রূর

হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো
উত্তর বাহুতে টানো রাশ
কপালে জমেছে এত স্বেদ
শরীরে অস্ত্রের গুরুভার
একবার তাকাও বাঁ দিকে
শুয়ে আছে নিষ্পাদপ মাঠ
এবং তা এমনই নীরব
মনে হয় শূন্যতাও নেই
হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো
সম্মুখে পবিত্র অন্ধকার
সব পথ গেছে নিরুদ্দেশে
নিরুদ্দেশও আজ দেশ ছাড়া
অরণ্য পাহাড় কেটে গড়া
যত ছিল মায়া জনপদ
সব যেন ডানা মেলে আছে
হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো
চেয়ে দ্যাখো, থেমেছে সময়।

একজন মানুষের

সদ্য হাসপাতাল থেকে আসছি, সে এবার বেঁচে উঠবে
সমস্ত বিকেল এই বার্তা উড়িয়ে দিল বাতাসে
বিশেষ সংস্করণে
ট্রামে বাসে চৌরাস্তায় সকলেই বলাবলি করছে যেন
কে বাঁচলো, কে পেয়েছে নিশ্বাস ইজারা
কেউ তাকে চিনুক বা না চিনুক, অনেকেই নামই শোনেনি
তবু যে মৃত্যুর পাশে অসংখ্য মৃত্যুর ঘোরে এই একবার
বেঁচে ওঠা
এর চেয়ে বড় কিছু আর নেই এ মুহূর্তে
যেন এক ম্লান দিনে কুসুম গন্ধের ঝড়,
যেন কোনো সিংহাসনে বসে আছে আমাদের
প্রিয়তম মুহূর্তটি
যারা খুব মেতে আছে শিল্পে বা বাণিজ্যে কিংবা

শিকার ও শিকারীর গাঢ় গল্পে
তাদের চোখের সামনে এসে আমি কিছুই শুনি না, আমি
প্রত্যেকটি কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলি,
বেঁচে উঠবে, সে এবার বেঁচে উঠবে
রয়টার ও রাষ্ট্রপুঞ্জে মনে হয় পাঠিয়ে দি একজন মানুষের
বাঁচার কাহিনী !

মনে পড়ে যায়

ভালোবাসার জন্য কাঙালপনা আমার গেল না এ জীবনে
আমার গেল না কাঙালপনা এ জীবনে ভালোবাসার জন্য
যে-সব নদী শুকিয়ে গেছে, মরে ভূত হয়ে হারিয়ে গেছে
যে-সব আগাছা ভরা দুঃখী মাঠ উধাও হয়ে গেছে জনারণ্যে
ছেলেবেলায় শিউলি ফুল, কার্নিশে আটকানো ছেঁড়া ঘুড়ির
ফরফর শব্দ
কিছুই হারাতে দিতে ইচ্ছে করে না, যেন সবাই ফিরে আসবে
অন্ধকার সুড়ঙ্গের ওপাশে আলো যেমন ফিরে আসে স্মৃতির মধ্যে
যেমন নব যৌবনা নারীদের উপহাস ঝনঝন করে বাজে ঝর্নায়
কোনোদিন হারায় না, অবিরল পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে
কত রকম রং মেলানো দেশে
পুরোনো বাড়ির অন্ধকার ঘরে শূন্যতার মধ্যেও এক
বিশাল হাঁ করা শূন্যতা চেয়ে থাকে
আকাশ মিলিয়ে যায়, জোয়ারে ভেসে যায় বন্ধুত্ব, আয়ু
এরই মধ্যে এক দমকা হাওয়া এসে সান্ধ্য ভাষায় প্রশ্ন করে :
মনে আছে ?
তখনই ছটফটিয়ে ওঠে বুক, সমস্ত বিচ্ছেদের দুঃখ
মনে পড়ে যায় ।

এ রকম ভাবেই

আমাদের চমৎকার চমৎকার দুঃখ আছে
আমাদের জীবনে আছে অনেক তেতো আনন্দ
আমাদের মাসে দু'একবার মৃত্যু আছে, আমরা
একটুখানি মরে আবার বেঁচে উঠি
আমরা গোপনে ভালোবাসার জন্য কাঙাল হয়ে
প্রকাশ্যে ভালোবাসাকে করি অস্বীকার
আমরা সার্থকতা নামে এক ব্যর্থতার পেছনে ছুটে ছুটে
কিনে নিই অসুখী সুখ
আমরা মাটি ছেড়ে দশতলায় উঠে ফের মাটির জন্য
হাহাকার করি
আমরা প্রতিবাদের জন্য দাঁতে দাঁত ঘষে পরমুহূর্তে
দেখাই হাসি মুখের মুখোশ
আমরা বঞ্চিত মানুষের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিন দিন
আরও বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলি
আমরা জাগরণের মধ্যে ঘুমোই এবং
স্বপ্নের মধ্যে জেগে থাকি
আমরা হারতে হারতে বাঁচি এবং জয়ীকে দিই ধিক্কার
সব সময়ই মনে হয় এ রকম নয়, এ রকম নয়
অন্য কিছু অন্য কোনো ভাবে বাঁচা
তবু এই রকম ভাবেই অসমাপ্ত নদীর মতন
লক্ লক্ করে এগোতে থাকে জীবন…

কাছাকাছি মানুষের

যারা খুব কাছাকাছি তাদের গভীরে যেতে যেতে
একদিন থেমে যাই, কেননা, এমন দূর পথ
যেতে হবে, তাও তো ছিল না জানা, যারা খুব চেনা
তাদের হৃদয় খুব জানাশোনা ভেবে বসে আছি
যত ভালোবাসা স্নেহ পাবার নিয়মে পেয়ে গেছি
কখনো ভাবিনি তার প্রত্যেকের ভিন্ন বর্ণচ্ছটা
প্রত্যেক হৃদয়ে বহু কুয়াশার ইন্দ্রজাল, মৃদু অভিমান

কাছাকাছি মানুষের বিশাল দূরত্ব দেখে থমকে গিয়ে দেখি
ফেরার রাস্তাও যেন মুছে গেছে, সেই থেকে আমি
কাছাকাছি মানুষের সুদূর রহস্যে মিশে আছি।

মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো

মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো, শালিকেরা ফেলে যায় খড়কুটো
চৈত্রের বাগানে
ব্যস্ত কাঠবিড়ালির পায়ে পায়ে ঘোরে মৃত্যু, তুলে নিয়ে এসো,
যে রকম শীতে
উড়ে যায় তুলো-বীজ, বাগানের গর্ভ-গৃহে রেশমি কোমল
বিকেলের আঁচ
মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো, পাহাড় চূড়ায় আনো, ঈগলেরা মৃত্যু
খুব ভালোবাসে
বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে উড়ে যায়, মৃত্যুর রুমাল উড়ে যায়,
নদী প্রান্তে একা
কেউ বসে আছে কারো প্রতীক্ষায়, নিচু ঝোপে সাপের খোলস,
হেমকান্তি ফুল
দেখা হবে সন্ধ্যাবেলা, মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো, ওষ্ঠে ওষ্ঠ ছুঁয়ে
পান করা হবে
সুউচ্চ মিনারে জ্বলে রাত্রি, যেন কোনো এক বারুদখানায়
লেগেছে আগুন
তার পাশ দিয়ে চলা, খুব শান্ত, সন্ন্যাসীর ঘুমের মতন
প্রকৃত স্তব্ধতা
এ রকমই কথা ছিল, আমার তোমার মৃত্যু কাছাকাছি এসে
ভাব করে নেবে।

কৃত্তিবাস

ছিলে কৈশোর যৌবনের সঙ্গী, কত সকাল, কত মধ্যরাত,
সমস্ত হল্লার মধ্যে ছিল সুতো বাঁধা, সংবাদপত্রের খুচরো গদ্য
আর প্রাইভেট টিউশানির টাকার অর্ঘ্য দিয়েছি তোমাকে, দিয়েছি ঘাম,

ঘোরাঘুরি, ব্লক, বিজ্ঞাপন, নবীন কবির কম্পিত বুক, ছেঁড়া পাঞ্জাবি
ও পাজামা পরে কলেজ পালানো দুপুর, মনে আছে মোহনবাগান
লেনের টিনের চালের ছাপাখানায় প্রুফ নিয়ে বসে থাকা ঘণ্টার পর
ঘণ্টা, প্রেসের মালিক বলতেন, খোকা ভাই, অত চার্মিনার খেও না,
গা দিয়ে মড়া পোড়ার গন্ধ বেরোয়, তখন আমরা প্রায়ই যেতাম
শ্মশানে, শরতের কৌতুক ও শক্তির দুর্দান্তপনা, সন্দীপনের চোখ মচকানো,
আর কী দুরন্ত নাচ
সমরেন্দ্র, তারাপদ আর উৎপলের লুকোচুরি, বুক খোলা হাস্য——
জমে উঠেছিল এক নদীর কিনারে, ছিটকে উঠেছিল জল, আকাশ
ছেয়েছিল লাল রঙের ধুলোয়, টলমল করে উঠেছিল দশ দিগন্ত, তারপর
আমরা ব্যক্তিগত জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে বাতাস সাঁতরে চলে গেলাম
নিরুদ্দেশে।

হে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ

হে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ তোমাদের জন্য
চঞ্চল সুখ সমৃদ্ধি প্রার্থনা করি
তোমার জীবন ও জীবন যাপনে এনো বিশুদ্ধ ইয়ার্কি
তোমরা আকাশ থেকে এনো মুক্তি ফল, যার বর্ণ সোনালি, পায়ের তলায়
ভূমি থেকে রক্ত ধোয়া শস্য
তোমরা নদীগুলিকে স্রোতস্বিনী রেখো, নারীদের
কূল প্লাবিনী
তোমাদের সঙ্গিনীরা যেন আমাদের নারীদের মতন
ভালোবাসা চিনতে ভুল না করে
তোমাদের ছাপাখানা যেন নিরুপদ্রব খোলা থাকে
তোমাদের কালের মানুষ যেন শুধু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই
উপবাস করে মাসে একদিন
তোমরা মুছে ফেলো সংখ্যাতত্ত্ব, যাতে তোমাদের বিদ্যুতের
হিসেব কষতে না হয়
কয়লার মতন কোনো কালো রঙের জিনিস তোমরা
কোনোদিন শয়ন ঘরে আলোচনায় এনো না
তোমাদের গৃহে আসুক গোলাপ গন্ধময় শান্তি, তোমরা সারা রাত
বাড়ির বাইরে ঘুরে বেড়িও

হে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ, আত্ম প্রতারণাহীন ভাষণে পবিত্র হোক
তোমাদের হৃদয়
তোমরা নিষ্পাপ বাতাসে আচমন করে কুণ্ঠাহীন
সম্ভোগে মেতে থেকো
তোমরা পাতাল রেলে চেপে নিয়মিত যাওয়া আসা ক'রো স্বর্গে !

যবনিকা সরে যায়

যবনিকা সরে যায়, দেখি দূর অন্ধকার স্মৃতির ওপারে
শতশত বন্দিশালা, ভরে আছে ঝুল কালি ধোঁয়া
অথবা পুজোর ঘণ্টা, অথবা মদির লাস্য গীত
এ এমন কারাগার, যেখানে প্রহরীবৃন্দ বড় বেশি পরিহাসপ্রিয়
শব্দের আহ্লাদে তারা লোহার বদলে আনে সোনার শৃঙ্খল ।

যবনিকা সরে যায়, দেখি এক অসত্য সমাজে
অলীক কুনাট্য রঙ্গে রাঢ় বঙ্গ বুঁদ হয়ে আছে
উচ্ছিষ্ট ভোজীরা মেতে আছে লোভী প্রতিযোগিতায়
বিজ্ঞ ও ভাঁড়েরা যেন ব্যগ্র হয়ে করে নেয় ভূমিকা বদল ।

যবনিকা সরে যায়, দেখি সব দৃশ্যকে পেরিয়ে অন্য আলো
ভয় ভেঙে, কান্না ভেঙে বিপন্নেরা বেরিয়ে এসেছে রাজপথে
রক্ত লোলুপের ঝাড় থেকে উঠে এলো কোনো প্রকৃত মহান রক্তদাতা
সপ্তরথী ঘেরা তবু ঘোর যুদ্ধে মেতে আছে খর্বকায় একাকী ব্রাহ্মণ
এক একটি দেয়াল ভাঙে, হুহু করে আসে সুবাতাস
কিছু গ্লানি মুছে ফেলে ঊনবিংশ শতাব্দীটি পাশ ফিরে শোয় ।

এখন

দারুণ সুন্দর কিছু দেখলে আমার একটু একটু
কান্না আসে
এমন আগে হতো না,
আগে ছিল দুরন্ত উল্লাস

আগে এই পৃথিবীকে জয় করে নেবার বাসনা ছিল
এখন মনে হয় আমার এই পৃথিবীটা
বিলিয়ে দিই সকলকে
পরশুরামের মতো রক্তস্নান সেরে
চলে যাই দিগন্ত কিনারে
যত সব মানুষকে চিনেছি, তাদের ডেকে বলতে ইচ্ছে হয়
নাও, যার যা খুশি নাও,
শিশির ভেজা মাঠে শুয়ে থাক কিছু সুখী মাথা।

কবিতা হয় না

শাশ্বত সত্যের পাশে দাঁড় করাও তো ঐ ন্যাংটো
ভিখিরি বাচ্চাকে
উপনিষদের শ্লোকে ব্যাখ্যা করো গাড়ি বারান্দার নিচে
ফুটপাথে হলুদ খিচুড়ি
ঈশ্বরের কলার চেপে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়
ময়না, দাসপুরে
মরিচঝাঁপিতে গেলে কার্ল মার্কসও বিব্রত হয়ে বলে উঠবেন
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে !

রুখু মাঠে হঠাৎ অচেনা কোনো মানুষের পাশে এলে
সত্যি মনে হয়
দেশোদ্ধারকারীরা সব পরে আছে উল্টো দিকে জামা
খেতে না-পাওয়া ও পাওয়া এর মধ্যে রয়ে গেছে
শহুরে ব্যাপারীদের শুধু বাক্ বিভূতির
তীব্র অপমান
মিথ্যের মিনার গড়া চতুর্দিকে, সজ্ঞান ভণ্ডামি, এর নাম
মানব সভ্যতা।

যদিও কবিতা লিখে কোনোদিন কেউ পারেনি এবং পারবে না
কোনো ব্যবস্থা বদলাতে
কবিরা উন্মার্গগামী, পলাতক, কেউবা চেঁচিয়ে হাততালি পায়
অথবা শিল্পের নামে খোলসে লুকোয়

তবু কেউ সায়াহ্নের ঈষদুষ্ণ কাল্পনিক যুবতীর
চোখ চমকানো রূপ বর্ণনার আগে
অকস্মাৎ রেগে গিয়ে
দু' একটা চাঁছাছোলা খেদ বাক্য লিখে ফেলে, যা আসলে
বলাই বাহুল্য,
কবিতা হয় না !

পুনর্জন্মের সময়

নদীর সঙ্গে খেলা শুরু করবার মুহূর্তে
আমার অন্ধকার পছন্দ হয়নি
আমি নক্ষত্রলোককে সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করা ভাষায়
ডাক দিয়ে বললাম, আলো দেখাও !
চাঁদের অভিমান হয়েছিল, কিন্তু নীহারিকাপুঞ্জ
নিচু হয়ে এলে
কোনো দৈব নির্দেশ ছাড়াই বাতাস উড়িয়ে নিলো
নদীটির ওড়না
আমার শরীরে অসহ্য উত্তাপ, আমি
সূর্যলোকের আগন্তুক
শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া খুলে
ঝাঁপ দিলাম
নগ্ন
জলস্রোতে
দু' পাশে উদগ্রীব অরণ্য, ধোপার কাপড় কাচার
শব্দের মতন হরিণের ডাক
আমাদের জিভে জিভে খেলা শুরু হয়
নদীর ছোট কোমল স্তন ও
পারস্য ছুরিকার মতন উরুদ্বয়ে
আমি দিই গরম আদর
তারপর মৃত্যু ও জীবন, জীবন ও মৃত্যু
তারপর জেগে ওঠে নাদ ব্রহ্ম
অন্তরীক্ষে ধ্বনিত হয় ওঁং শান্তি
চুন ভেজানো জলের মতন পাতলা আলোয়

পুনর্জন্মের সময় আমি শুনতে পাই
আমাদের ভবিষ্যৎ সন্ততিদের জন্য অতীত-পুরুষরা
রেখে যাচ্ছেন বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ভরা শুভাশিস।

সারাটা জীবন

আমাকে দিও না শান্তি, শিয়রের কাছে কেন এত নীল জল
কোথায় বোঝার ভুল ছিল তাই ঝড় এলো সন্ধের আকাশে
আমাকে দিও না শান্তি, কেন ফেলে চলে গেলে অসমাপ্ত বই
চতুর্দিকে এত শব্দ, শব্দ গিরিবর্ত্মে ঝোলে অদ্ভুত শূন্যতা
আকাশের গায়ে গায়ে কালো তাঁবু,-জগতের সব দীন দুঃখী শুয়ে আছে
একজন শুধু বাইরে, তুমি তার একাকিত্ব তুলে নাও মরাল গ্রীবার মতো হাতে
আমাকে দিও না শান্তি, নীরা, দাও বাল্যপ্রেমিকার স্নেহ, সারাটা জীবন
আমি
অবাধ্য শিশুর মতো প্রশ্রয় ভিখারী!

শিল্প

শিল্প তো সার্বজনীন, তা কারুর একলার নয়
এ কথা ভাবলেই বড় ভয় লাগে, এই সত্য অসত্যের মতো গাঢ়
ভয় লাগে, বড় ভয় লাগে।

নীরা নাম্নী মেয়েটি কি শুধু নারী! মন বিঁধে থাকে
নীরার সারল্য কিংবা লঘু খুশি,
আঙুলের হঠাৎ লাবণ্য কিংবা
ভোর ভোর মুখ
আমি দেখি, দেখে দেখে দৃষ্টিভ্রম হয়
এত চেনা, এত কাছে, তবু কেন এতটা সুদূর?
নীরার রূপের গায়ে লেগে আছে যেন শিল্পচ্ছটা
ভয়, চাপা দুঃখ হিম হয়ে আসে।

নীরা, তুমি বালিকার খেলা ছেড়ে শিল্পের জগতে
যেতে চাও ?
প্রতীক অরণ্যে তুমি মায়া বনদেবী ?
তোমার হাসিতে যেন ইতালির এক শতাব্দীর মৃদু ছায়া
তোমার চোখের জলে ঝলসে ওঠে শিল্পের কিরণ
এ শিল্প মধুর কিন্তু ব্যক্তিগত নয়
শিল্প সহবাসে আমি তোমাকে স্বৈরিণী হতে
ছেড়ে দেবো কোন্ প্রাণে বলো !
না, না, নীরা, ফিরে এসো, ফিরে এসো তুমি
তোমাকে আমার কিংবা আমাকে তোমার কোনো
নির্বাসন নেই
ফিরে এসো, এই বাহুঘেরে ফিরে এসো !

দরজার পাশে

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তোমায় হঠাৎ চুমুতে
চমকে দিয়েছি
ঝড়ের মধ্যে আলোর ঝলক, রূপালি চামচে
লাবণ্য পান
চোখ ছিল দ্রুত, হাতে বিদ্যুৎ, বুকে মেঘ-নাদ
দরজার পাশে
সব কথা শেষে বিদায়ের আগে যেমন সহসা
শেষ কথা থাকে
দরজার পাশে তেমনি নীরব, তেমনি থমকে
মুখোমুখি দেখা
দুটি নিশ্বাসে অরণ্যঘেরা পাথুরে দেশের
মৃদু পরিমল
ছুঁয়ে গেল এই ঘাম নুন মেশা শহুরে বাতাসে
দুই সমুদ্র
জীবন ছাপিয়ে অনন্তকাল, তার থেকে ছেঁচে
এক মুহূর্ত
না-লেখা কবিতা, না-পাঠানো চিঠি, না-হওয়া ভ্রমণ
না-দেখা স্বপ্ন !

কোথায় গেল, কোথায়

যারা বারুদ ঘরে আগুন দিতে গিয়েছিল, তাদের তিনজন
এখন দেয়ালে ঝুলছে, আলাদা মুখ, একই রকম চাহনি
বাকি এগারোজন হারিয়ে গেল, কোথায় গেল, কোথায় ?

আর কিছুদিন পর এই শতাব্দী নিঃশব্দে বিদায় নেবে
অনড় গম্ভীর মহাকূর্মের পিঠে ছেনি হাতুড়ি দিয়ে দিয়ে লেখা
হবে হিসেব
যারা সিংহের মুখে লাগাম পরাতে গিয়েছিল, তাদের দু'জন
শেষ পর্যন্ত পেয়েছে সিংহাসন, গালিচায় রেখেছে পায়ের ছাপ
বাকি সাতজন হারিয়ে গেল, কোথায় গেল, কোথায় ?

আসবে নতুন মানুষ, গড়ে উঠবে নতুন সুখী সমাজ
বড় সমবেদনায় তারা একদিন পেছন ফিরে তাকিয়ে বন্দী
হয়ে পড়বে এক দুরন্ত ধাঁধায়
জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির দিকে সমান তালে নিঃশঙ্ক পা ফেলে
গিয়েছিল যে পাঁচজন
তাদের একজনেরও কোনো নাম বা মুখচ্ছবি নেই, তাহলে
সত্যি কি কেউ যায়নি ?

ব্যর্থ প্রম

প্রতিটি ব্যর্থ প্রেমই আমাকে নতুন অহঙ্কার দেয়
আমি মানষু হিসেবে একটু লম্বা হয়ে উঠি
দুঃখ আমার মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত
ছড়িয়ে যায়
আমি সমস্ত মানুষের থেকে আলাদা হয়ে এক
অচেনা রাস্তা দিয়ে ধীরে পায়ে
হেঁটে যাই

সার্থক মানুষদের আরো-চাই মুখ আমার সহ্য হয় না
আমি পথের কুকুরকে বিস্কুট কিনে দিই
রিক্সাওয়ালাকে দিই সিগারেট
অন্ধ মানুষের সাদা লাঠি আমার পায়ের কাছে
খসে পড়ে
আমার দু'হাত ভর্তি অঢেল দয়া, আমাকে কেউ
ফিরিয়ে দিয়েছে বলে গোটা দুনিয়াটাকে
মনে হয় খুব আপন

আমি বাড়ি থেকে বেরুই নতুন কাচা
প্যান্ট শার্ট পরে
আমার সদ্য দাড়ি কামানো নরম মুখখানিকে
আমি নিজেই আদর করি
খুব গোপনে
আমি একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ
আমার সর্বাঙ্গে কোথাও
একটু ময়লা নেই
অহংকারের প্রতিভা জ্যোতির্বলয় হয়ে থাকে আমার
মাথার পেছনে
আর কেউ দেখুক বা না দেখুক
আমি ঠিক টের পাই
অভিমান আমার ওষ্ঠে এনে দেয় স্মিত হাস্য
আমি এমন ভাবে পা ফেলি যেন মাটির বুকেও
আঘাত না লাগে
আমার তো কারুকে দুঃখ দেবার কথা নয়।

চোখ নিয়ে চলে গেছে

এই যে বাইরে হু হু করা ঝড়, এর চেয়ে বেশি
বুকের মধ্যে আছে
কৈশোর জুড়ে বৃষ্টি বিশাল, আকাশে থাকুক যত মেঘ,
যত ক্ষণিকা
মেঘ উড়ে যায়

আকাশ ওড়ে না
আকাশের দিকে
উঠছে নতুন সিঁড়ি
আমার দু বাহু একলা মাঠের জারুলের ডালপালা
কাচ ফেলা নদী. যেন ভালোবাসা
ভালোবাসবার মতো ভালোবাসা—
দু'দিকের পার ভেঙে
নারীরা সবাই ফুলের মতন, বাতাসে ওড়ায়
যখন তখন
রঙিন পাপড়ি
বাতাস তা জানে, নারীকে উড়াল দিয়ে নিয়ে যায়
তাই আমি আর প্রকৃতি দেখি না,
প্রকৃতি আমার চোখ নিয়ে চলে গেছে !

কিছু পাগলামি

জুলপি দুটো দেখতে দেখতে সাদা হয়ে গেল !
আমাকে তরুণ কবি বলে কেউ ভুলেও ভাববে না
পরবর্তী অগণন তরুণেরা এসেছে সুন্দর ক্রুদ্ধ মুখে
তাদের পৃথিবী তারা নিজস্ব নিয়মে নিয়ে নিক !
আমি আর কফি হাউস থেকে হেঁটে হেঁটে হেঁটে
নিরুদ্দিষ্ট কখনো হবো না

আমি আর ধোঁয়া দিয়ে করবো না ক্ষিদের আচমন্ !

আমি আর পকেটে কবিতা নিয়ে ভোরবেলা
বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যাবো না কখনো
হসন্তকে এক মাত্রা ধরা হবে কিনা এই তর্কে আর
ফাটাবো না চায়ের টেবিল
আর কি কখনো আমি সুনীলকে মিল দেব
কন্ডেন্সড্ মিল্কে ?

এখন ক্রমশ আমি চলে যাবো তুমি'র জগৎ ছেড়ে

আপনি'র জগতে
কিছু প্রতিরোধ করে, হার মেনে, লিখে দেব
দুটি একটি বইয়ের ভূমিকা
অকস্মাৎ উৎসব বাড়িতে পূর্ব প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হলে
তার হৃষ্ট পুষ্ট স্বামীটির চোখে চোখ, দাঁতে ও জিহ্বায়
রাজনীতি নিয়ে আলোচনা

দিন যাবে, এরকমভাবে দিন যাবে !

অথচ একলা দিনে, কেউ নেই, শুয়ে আছি আমি আর
বুকের ওপরে প্রিয় বই
ঠিক যেন কৈশোর পেরিয়ে আসা রক্তমাখা মরূদ্যান
খেলা করে মাথার ভিতরে
জঙ্গলের সিংহ এক ভাঙা প্রাসাদের কোণে
ল্যাজ আছড়িয়ে তোলে গম্ভীর গর্জন
নদীর প্রাঙ্গণে ওই স্নিগ্ধ ছায়া মূর্তিখানি কার ?
ধড়ফড় করে উঠে বসি
কবিতার খাতা খুলে চুপেচাপে লিখে রাখি
গতকাল পরশুর কিছু পাগলামি !

দেখি মৃত্যু

আমি তো মৃত্যুর কাছে যাইনি একবারও
তবুও সে কেন ছদ্মবেশে
মাঝে মাঝে দেখা দেয় ।
এ কেমন অভদ্রতা তার ?
যেমন নদীর পাশে দেখি এক চাঁদ খসা নারী
তার চুল মেলে আছে
অমনি বাতাসে ওড়ে নশ্বরতা
ভয় হয়, বুক কাঁপে, সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে !
যখনই সুন্দর কিছু দেখি,
যেমন ভোরের বৃষ্টি
অথবা অলিন্দে লঘু পাপ

অথবা স্নেহের মতো শব্দহীন ফুল ফুটে থাকে
দেখি মৃত্যু, দেখি সেই গোপন প্রণয়ী।
ভয় হয়, বুক কাঁপে সব কিছু দিয়ে যেতে হবে!

মেলা থেকে ফেরা পথে

ভাঙা-বিকেলের শেষে মেলা থেকে যারা ফিরেছিল
চেনা পথে
তারা কি সবাই ফিরে গেছে ঠিকঠাক
রক্তাক্ত দিগন্ত দেখে কেউ ছুটে যায়নি ওপারে?

অন্ধকারে নেমে এলে
আমরা এক
অন্য পৃথিবীতে
বেঁচে থাকি
দু' পাশে অব্যক্ত বন, টিলার উৎরাই ধরে
যেতে যেতে
মনে হয় সকলই অচেনা
কার ছিল ঘর বাড়ি
ছিল নারী
স্নেহ প্রেমে মায়ার সংসার?
ছলচ্ছল শব্দ করে চলে গেল যে-ঝর্নাটি
সে কি ছিল?
অথবা এইমাত্র জন্ম ছিল?
চিরকাল আকাশ বলেছি যাকে
চোখ তুলে দেখি সে-ই
আজ মহাকাশ
আমার সর্বাঙ্গে লাগে মৃত নক্ষত্রের হিম ধুলো
পথে যা ঝিমঝিম করে
তাও বুঝি নীহারিকা আলো?

মেলা থেকে ফেরা পথে কোনো একদিন আমি
নিশ্চিত দেখেছি

বিপরীতমুখী এক মন-হারা
একলা মানুষ
তার কোনো ভাষা নেই, অনন্তকালের যাত্রী,
সে কিছু দেখে না
সপ্তম দিগন্ত পার হয়ে যেন সে চলেছে
অষ্টমের দিকে
আমি কত দূরে যাবো কিছুই জানি না !

লেখা শেষ হয়নি, লেখা হবে

আমিও লিখেছি তার একইসঙ্গে পবিত্র ও লোভনীয় ওই—
দুই শুভ্র স্তনের মাধুরী নিয়ে,
তবু লেখা শেষ হয়নি, আরো অনেকেই লিখে যাবে,
'ফেরা' এই শব্দটিকে
ঘুরে ফিরে আর কেউ কেউ দেবে
নতুন ঝঙ্কার,
এখনো জন্মায়নি, সেই নতুন কবিতা তার
কোমরের বাঁক দেখে
পেয়ে যাবে নদীর উপমা,
অসম্ভব শব্দটিকে, নেপোলিয়ানের মতো
অনেকেই
বারবার কেটে কুটে
তিনমাত্রা করে নেবে শেষে,
নিভৃত গোলাপ তার পাপড়ি মেলে দাবি করবে
আর একটি কবির,
উঁচু নিচু মানুষেরা সাম্য পাবে গদ্য কবিতায়,
কবরখানার ফুল-চোর অকস্মাৎ দেখতে পাবে
সেও বন্দী
ছন্দ মিলে কঠিন বন্ধনে ।
ভালোবাসা আর ঈর্ষা একই মন্দিরের মধ্যে
ঘেঁষাঘেঁষি করে
থেকে যাবে,
বুদ্ধ পূর্ণিমার রাত্রে

নাস্তিকেরা বসে থাকবে
আকাশ ভাসানো ঠাণ্ডা নরম আলোয় মাথা পেতে,
উল্লাস শব্দটি বড় নীল
ও কি ভ্রমে কোনোদিন হয়েছে ধূসর ?
এমনকি অন্ধকারে বাদামী মেঘেরা জানে
উল্লসিত হৃদয় বদলাতে
এরই মধ্যে হাহাকার বাতাসকে করে দেয় কালো ।
সে কথাও লেখা হবে, কেউ লিখে যাবে,
মানুষের দুঃখ দূর হতে হতে
ততদিনে, আশা করা যাক
হারাবে না সমস্ত সুন্দর ।

স্বর্গ নগরীর চাবি

সূচিপত্র

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম ১৭৩, নাচ-খেলা ১৭৪, একটাই তো কবিতা ১৭৪, একটি ঐতিহাসিক চিত্র ১৭৫, প্রথম লাইন ১৮৬, ফিরে এসো ১৮৬, আসলে একটিও ১৮৭, দিন-রাতের মানুষ ১৮৮, কৌতুক ১৮৮, নীরার জন্য ১৮৯, মনে পড়ে ১৮৯, অভিশাপ ১৯০, যোগব্রত ১৯০, অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত ১৯২, দূর যাত্রার মাঝপথে ১৯২, ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে ১৯৩, বুদ্ধের স্মৃতিতে ১৯৬, মানস ভ্রমণ ১৯৭, ফেরা ১৯৮, বন্দী ১৯৮, আগামী পৃথিবীর জন্য ১৯৯, মুক্তি ২০০, দেখা হবে ২০১, কই, কেউ তো ছিল না ২০২, বিক্ষিপ্ত চিন্তা ২০৩, দীর্ঘ অন্ধকার ২০৩, এসো চোখে চোখে ২০৪, সেই সন্ধ্যা ও রাত্রি ২০৪, আলাদা মানুষ ২০৫, বারবার ফিরে আসে ২০৫, প্রতীক জীবন ২০৬, স্পর্শটুকু নাও ২০৬, অচেনা দেবতা ২০৭, তিনটি অনুভব ২০৭, শূন্যে বাজে ২০৮, ঝড় ২০৮

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না

বুঝি পাহাড়ের পায়ে পড়ে ছিল নীরব গোধূলি
নারী-কলহাস্য শুনে ভয় পেল ফেরার পাখিরা
পাথরের নিচে জল ঘুমে মগ্ন কয়েকশো বছর
মোষের পিঠের মতো, রাত্রির মেঘের মতো কালো
পাথর গড়িয়ে যায়, লম্বা গাছ শব্দ করে শোয়
একজন ক্ষ্যাপা লোক ঝর্নাটিতে জুতোসুদ্ধ নামে
কেউ কোনো দুঃখ পায় না, চতুর্দিক এমনই স্বাধীন !

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না

এই যে সবুজ দেশ, এরও মধ্যে রয়েছে খয়েরি
রূপের পাতলা আভা, তার নিচে গহন গভীর
অ্যালুমিনিয়াম-রঙা রোদ্দুরের বিপুল তাণ্ডব
বনের ভিতরে এত হাসিমুখ ক্ষুধার্ত মানুষ
যে-জন্য এখানে আসা, তার কোনো নাম গন্ধ নেই

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না

এখানে ছিল না পথ, আজ থেকে যাত্রা শুরু হলো
একটি সঠিক টিয়া নামটি জানিয়ে উড়ে যায়
বিবর্ণ পাতায় ছোঁয়া ভালোবাসা-বিস্মৃতির খেদ
পা ছড়িয়ে বসে আছে ছাগল-চরানো বোবা ছেলে
উদাসী ছায়ার মধ্যে ভাঙা কাচ, নরম দেশলাই
এই মাত্র ছুটে এল যে-বাতাস তাতে যেন চিরুনির দাঁত

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না...

নাচ-খেলা

পাহাড়ের সানুদেশে জ্বলছে আগুন
এখানে সমস্ত রাত নাচ খেলা হবে
গর্ভবতী মেঘ, আজ এদিকে এসো না !
সারাদিন এলোমেলো পাগলা বাতাসে
উড়েছে অসংখ্য রেণুকণা
যেন এই দুর্দান্ত দাহনে হলো ফুলদের ভালোবাসাবাসি
শুকনো পাতারা সব স্বেচ্ছাসেবকার মতো জড়ো হলো নিচে
চিকন সবুজ আর খয়েরিরা করে নেয় হাস্য-পরিহাস
অতি-কাছে সুদূরকে ডাকে
বিকেল গড়িয়ে যায় দিগন্ত পোড়ানো
মদস্রাবী সায়াহ্নের দিকে
দ্রিদিম দ্রিদিম ধ্বনি তুলে দেয় অমর্ত্যবাসীরা
চোখ-মচকানো আলো খুলে দেয় চাঁদ
গর্ভবতী মেঘ, আজ এদিকে এসো না
ছিঁচকে জোনাকিকুল, আজ ঘোর সন্ধ্যায় দূরে যা !
আগুন জ্বলেছে
আগুনের মুখ থেকে উড়ে আসে ফুল্‌কি যেন খুনখারাবি রং
শরীরে হোরির জামা অনিমন্ত্রিতেরা এসেছে
ঝর্নার দুধারে যারা বসে আছে সকলের মৃত্যুর মুখোশ
আর কেউ আসুক বা না-আসুক
এখানে সমস্ত রাত নাচ-খেলা হবে ।

একটাই তো কবিতা

একটাই তো কবিতা
লিখতে হবে, লিখে যাচ্ছি সারা জীবন ধরে
আকাশে একটা রক্তের দাগ, সে আমার কবিতা নয়
আমার রাগী মুহূর্ত, আমার ব্যস্ত মুহূর্ত কবিতা থেকে বহুদূরে
সরে যায়
যে দুঃখের যমজ, সে তা সহোদরকে চেনে না

একটাই তো কবিতা লিখতে হবে
অথচ শব্দ তাকে দেখায় না সহস্রার পদ্ম
যজ্ঞ চলেছে সাড়ম্বরে, কিন্তু যাজ্ঞসেনী অজ্ঞাতবাসে
একটাই তো কবিতা
কখন টলমলে শিশিরের শালুক বনে ঝড় উঠবে তার ঠিক নেই
দরজার পাশে মাঝে মাঝে কে যেন এসে দাঁড়ায় মুখ দেখায় না
ভালোবাসার পাশে শুয়ে থাকে হিংস্র একটা নেকড়ে
নদীর ভেতর থেকে উঠে আসে গরম নিশ্বাস
একটাই তো কবিতা লিখতে হবে

অগোছালো কাগজপত্রের মধ্য থেকে উঁকি মারে ব্যর্থতা
অপমান জমতে জমতে পাহাড় হয়, তার ওপর উড়িয়ে দেবার
কথা স্বর্গের পতাকা
শজারুর মতন কাঁটা ফুলিয়ে চলা-ফেরা করতে হয় মানুষের মধ্যে
রাত্রে সিগারেট ধরিয়ে মনে হয়, এ এক ভুল মানুষের জীবন
ভুল মানুষেরা কবিতা লেখে না, তারা অনেক দূরে, অনেক দূরে
যেন বজ্রকীট উল্টো হয়ে পড়ে আছে, এত অসহায়
নতুন ইতিহাসের মধ্যে জড়িয়ে থাকে সম্রাটদের কাঙালপনা
একটাই তো কবিতা, লিখে যাচ্ছি
লিখে যাবো, সারা জীবন ধরে
আবার দেখা হবে, আবার দেখা হবে, আবার দেখা হবে !

একটি ঐতিহাসিক চিত্র

তাঁতীপাড়ায় পেছন দিকে নাবাল জমি
তার ওপাশে মুসলমানী গ্রাম
ওদের দিকে আকাশটাও অনেকখানি গাঢ়
ওদের ভোর মোরগঝুঁটি, এদিকে ভোর
হাঁসের মতন সাদা
একেক দিন কুয়াশালীন, একেক দিন বৃষ্টি সারাবেলা
এখানে সব নিথর চুপ, ঘাসফড়িং-এর মুখের মতন
কাঁচা-সবুজ শান্ত
এখানে শীত-গ্রীষ্ম আসেন, যেমন আসেন জন্ম এবং মৃত্যু

এবং মাইল পনেরো দূরে আছেন সভ্যতা।

পাট ক্ষেতের সীমানা ঘিরে ছিলেন এক
কূল ভাঙানো নদী
তিনি এখন দেশান্তরে গেছেন
শুকনো খাদ যেন একটা বাঁকা রাস্তা
এখনো তার বুকে মাখানো ছেলেবেলার ধুলো
বুড়ো একটা তেঁতুল গাছ, ঠাকুর্দার মতন যার আঙুল, যার
নিচে দাঁড়ালে সকাল-সন্ধ্যা
লাগে চিরুনি-হাওয়া
প্রাইমারির মাস্টারমশাই ওখানে রোজ ভাঙা-আলোয়
বাড়ি ফেরার পথে থমকে
সাইকেলের বেল বাজিয়ে গুনগুনোন
রামপ্রসাদী গান
রাত্রিবেলা ওখানে কেউ যায় না
রাত্রিবেলা ওখানে তারা আসে
এখানে রাত ইঁদুর-জাগা, এখানে রাত সাত শিয়ালের রা
এখানে ঘুম পরিশ্রমী, ঘুমের বয়েস জাগার চেয়ে বেশি
এখানে সব জন্মবীজ অন্ধকারে এক প্রহরে
নারীরা লুফে নেয়
শেষ রাতের হলুদ চাঁদ দিঘির জলে একলা খেলা করে।

আমাদের এখানো কোনো বিখ্যাত ভাঙা মন্দির নেই
আমাদের ছোট কালী-বাড়িটির ছবি তুলতে কোনো সাহেব
এদিকে আসেননি কখনো
এখানে নেই কোনো বিধ্বস্ত নীলকুঠির অস্তিত্ব
তবু আমাদের এই গ্রামটি ঐতিহাসিক
এক লপ্তের ধান জমিতে রোজ চাষে যান পরাণের দাদামশাই
তাঁর বয়েস তিন হাজার বছরের চেয়ে কিছু বেশি
গৌতম বুদ্ধেরও জন্মের আগে থেকে তিনি
ঐ একই হাল গোরু নিয়ে
মাঠে নামছেন
দুপুরের খাঁ-খাঁ রোদে তিনি আকাশের দিকে তুলে ধরেন
তাঁর ঐতিহ্যময় মুখ

সম্রাট আকবর খাজনা নিয়েছেন ওঁর কাছ থেকে
পৌষের রাতে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে পরাণের দাদামশাই
এখনো ঘুম ভেঙে মাঠে ছুটে গিয়ে
আনন্দে নৃত্য করেন দু'হাত তুলে
আমাদের এখানে সব কিছুই অতি রহস্যময়ভাবে সরল
আমরা কয়লা দেখেছি রামজীবনপুরের হাটে
আমরা সোনা দেখেছি অশ্বিনী মণ্ডলের মেজো মেয়ের
বিয়ের সময়
আমরা মুক্তো দেখেছি ভোরবেলা ঘাসের ডগায়
আমরা হীরে-কুচি দেখেছি শ্যালো টিউবওয়েলের
জলে
রোদের ঝিলিকে
আমরা মরকত মণি দেখেছি আকাশে সূর্য-বিদায়ের
শেষ দৃশ্যে
আমরা ইস্পাত দেখেছি দাঙ্গায়
আমরা বারুদ দেখেছি জমি দখলের লড়াইয়ে।

দিঘিটির জল কুচকুচে কালো, কেউ এর নাম
রাখেনি কাজলা দিঘি
আমরা এখানে বছরের পাট পচাই
আমরা এ-জলে স্নান করি, রাঁধি, খাই
এই জলে ভাসে আমাদের প্রিয় নাম দেওয়া হাঁসগুলো
দিঘিটি বড়ই গম্ভীর, ওর হৃদয়ে রয়েছে সাতটি
আঁধার কুঠুরি
ও এমনই নারী, যারা শুধু নেয় ভালোবাসা, তার
প্রতিদানে কিছু দেয় না
(যেমন কেষ্ট বাড়ুরীর বউ), আমাদের কালো দিঘিটি
বড় বেশি এই জীবনে জড়ানো, এমন তো দিন যায় না যে ওকে
একবারও চোখে দেখি না
শুধু চোখে দেখা, কোনোদিন তবু দেখা তো দিলো না স্বপ্নে!
আমরা স্বপ্নে দেখেছি মাজরা পোকা
আমরা স্বপ্নে দেখেছি খরা ও বন্যা
আমরা স্বপ্নে দেখেছি স্বপন এবং স্বপ্না
কুমার-কুমারী যাত্রায় হাসে কাঁদে

আমরা স্বপ্নে দেখেছি চোরেরা কেটে নিয়ে যায় ধান
স্বপ্নে আমরা চমকে উঠেছি বুঝি-বা দাম পড়ে গেল
আলুর !
হে নিকষ কালো জলভরা দিঘি, এত কাছে তুমি এত নিষ্ঠুর
কখনো স্বপ্নে এলে না ?
মাঠের মধ্যে এক ঢ্যাঙা তালগাছ দম্পতি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে
ওখানেই ঘুচুড়ে আর
জিওলকাঠির সীমানা
ঐখানে একদিন এক মনসার জীব দংশেছিল
সনাতন দাসের ছেলে বলাইকে
ঘুচুড়ের দিকটা তখন ফাঁকা, জিওলকাঠির চাষীরা
ছুটে এলো আর্ত রব শুনে
তারা চটপট আঁটন দিয়েছিল তার পায়ে
বলাই জল জল বলে চ্যাঁচালে আজু শেখ ঢেলে দিয়েছিল
তার মুখে পানি
নদাই ঘোষের রায়ত গিয়াসুদ্দিন ছুটে গিয়েছিল
খবর রটাতে
কেউ কেউ বলেছিল, ওঝা
কেউ কেউ বলেছিল, টোটকা
ঝিমিয়ে পড়া চোখ কোনো রকমে খুলে
ইস্কুল ফাইনাল বলাই বলেছিল,
ইঞ্জেকশন !
পীর জাঙ্গাল পেরিয়ে শ্যামনগর, তারপর মানিকচকের খাল
গত বর্ষায় উড়ে গেছে যার সাঁকো
এখন অবশ্য সেখানে হাঁটু জল
তার ওপারে হিঙ্গুলের হেলথ্ সেন্টার
হিঁদু পাড়ার পালকি মেরামত হয়নি এক মাস
মোছলমান পাড়ার ডুলিতে চাপানো হলো
বলাইকে

ও বলাই, বলাই রে, ফিরে আয় বাপ
ও মা মনসা, তোমার পায়ে পড়ি
তোমায় গড়িয়ে দেবো রুপোর মাকড়ি
ওরে বলাই, তুই যে সাত বোনের এক ভাই

তুই ছাড়া আমার আর কেউ নাই
বলাইকে সাপে কাটলো, তার বৌটা যে পাঁচ মাসের পোয়াতী
ওরে বলাই, ফিরে আয়, সত্যপীরের সিন্নি দেবো,
ফিরে আয়, ফিরে আয়...
ঘুম থেকে তুলে ডাক্তারবাবুকে টেনে আনা হলো
আধো ঘুমন্ত বলাইয়ের সামনে
ডাক্তারবাবু প্রথমে চিৎকার করে বাপ মা তুলে
গালাগালি দিলেন যে কাকে
(বোধহয় ভগবানকে)
তারপর ডাক্তারবাবু বুকের জামা খুলে বললেন, মার,
তোরা মেরে আমার হাড়গোড়
ছাতু কর
এই সেন্টারের দরজা-জানলা, টেবিল-চেয়ার সব ভেঙেচুরে
সর্বনাশ করে দিয়ে যা
হারামজাদারা, এতদূর দিয়ে এসেছিস, চাষাভুষোর কখনো
ওষুধে রোগ সারে ?
আড়াই মাস কোনো ওষুধ চক্ষেই দেখিনি, যা, এখনো সময় থাকতে
যা
যাজপুরের হেরম্ব গুনিনের কাছে ছুটে যা

এমন কড়া জান বলাইয়ের, তবু সে বেঁচে গেল সে যাত্রায়
তিন বছরে সাতজন মরেছে আল কেউটের বিষে
বলাই মরলো না
এক মাস পর মুন্সীগঞ্জের হাটে আজু শেখের পিঠে
এক প্রকাণ্ড কিল মেরে
বলাই বললো, শালা
মোছলমানের হাতের জল খাইয়ে আমার
জাত মেরে দিইচিস ?
আজু শেখও চটপট জবাব দিলো, মাঠের মধ্যি পানি কোথায়
পাবো রে হারামজাদা
পস্যাব করে দিইচি তোর মুখে !
তারপর দু'জনে কাঁধ ধরাধরি করে ঢুকে গেল
গোদা-পা বিষ্টুর চা-মিষ্টির দোকানে

কে যায় ? ও, পরাণ মণ্ডল,
খবর-টবর কী গো, দাদা ?
খবর ভালো রে ভাই, ছোট মেয়েটার শুধু জ্বর
কে যায় ? ও, সাধনের ছোট ভাইটা নয় ?
খবর-টবর কী রে, হাট থেকে এলি ?
খবর শোনোনি দাদা, আজ থেকে বেড়ে গেল
পাম্পের ভাড়া ?
তাই নাকি ? কত ? কত ?
ডেলি চুয়াল্লিশ
কে যায় ? ও, ফজল মামুদ
খবর-টবর কী গো, মিঞা ?
দিন আনি দিন খাই, খবরের জুতসই মা-বাপ নাই !
কে যায় ? ও, হারু গোলদার
খবর-টবর কী রে, ছোঁড়া ?
জবর খবর আজ, সাত গোলে হেরে গেছে লক্ষ্মীকান্তপুর !
কে যায় ? ও, সহদেবের মা
খবর-টবর কী গো, ভালো ?
ভালো নাকি মন্দ হবে ? চতুর্দ্দিকে যত হিংসুটি !
কে যায় ? ও বাবা, এ যে গোরাই সামন্ত
পেন্নাম, এদিকে কোথা থেকে গেসলেন, জ্যাঠা ?
এলাম সদর থেকে, বলাইকে বলিস আমি মামলা জিতেছি !
কে যায়, খালেদ নাকি ? শোন্ তো এদিকে ভাইডি
শুকনো লঙ্কার দর তেজী না মিয়োনো ?
খবর জানি না, তবে দেখলাম তো বস্তাগুলো
ডাঁই হয়ে আছে !
কে যায় ? ও, বীরেশ্বরদা,
বলাইকে বলে দিও, তার আজ সর্বনাশ হলো !
কে যায় ? ও, রসিক বাবাজী,
খবর-টবর সব ভালো তো গোঁসাই ?
ভালো মন্দ কে কী জানে, রাধেশ্যাম যেমন রাখেন !
কে যায় ? ও, সুবল ভুঁইমালি
খবর-টবর কী রে, ছুটছিস কোথায় ?
খবরের মুখে ইয়ে, আজও হাটে নেই কেরাসিন !

কেরাসিন, কেরাসিন, কেরাসিন
দাও দাদা, দাও কিছু কেরাসিন
ওগো জোতদার দাদা, আমরা তোমার গাধা
জমিজমা নাও বাঁধা
দাও তবু, দাও কিছু কেরাসিন !
ওগো ভোট চাওয়া পার্টি, করে যাও ফোর টোয়েন্টি
যত খুশি
ইল্‌শে গুঁড়ির মতো ছিটে-ফোঁটা দেবে নাকো
কেরাসিন ?
ওরে কেরা কেরা রে, তুই কোথা গেলি রে ?
ওরে সিন সিন রে, তুই বুকের সিনারে
ওরে আমার ভর্তি কেরাসিনের বোতল
তুই আমাদের বাদলা রাতের গন্ধ বকুল
তোর সুবাসে প্রাণের মধ্যে আল কাটা জল
খলখলায়
তুই আমাদের হ্যাংলা মনের পদ্মমধু
তুই আমাদের দিন-ঘুমের হেমামালিনী !
তোকে গলায় জড়িয়ে ধরবো, গরমা গরম চুমো খাবো
তোকে নিয়ে একলা শোবো, আয় !
পাম্প চালানি, কাঠ জ্বালানি, ঘর ভরানি,
ছেলেপুলের বই খোলানি আয় !
কোথায় আলো, কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো
বিরহানলে কেরোসিন কিছু ঢালো !

আমরা প্রণাম জানাই তাঁকে, যিনি
সৃষ্টি করেছেন ট্রানজিস্টার বেতার
মাত্র দু' বস্তা ধানের বিনিময়ে তিনি আমাদের দিয়েছেন এই
অত্যাশ্চর্য উপহার
পৃথিবী আমাদের খবর রাখে না,
কিন্তু
আমরা জানি
পৃথিবীর হালচাল
আমরা জানি কানপুরের মাঠে সুনীল গাভাসকর
পরপর মেরেছে দু'খানা ছক্কা।

আমরা জানি বিলেতের বিমান বন্দরে সাহেবেরা
ন্যাংটো করে দেখে
আমাদের ভালো ভালো মেয়েছেলেদের
আমরা জানি কলকাতার বস্তির লোকগুলোকে স্বর্গে তুলবার জন্য
দয়ালু লোকেরা খুলছেন ক্লাব
অবাঙালী ছোট লাটসাহেব সেখানে বক্তৃতার
প্রথম দু' লাইন দেন বাংলায় !
আমরা জানি জয়প্রকাশ নারায়ণের ফোঁটা ফোঁটা হিসি
আর ইন্দিরা গান্ধীর বিচার নিয়ে
চলছে খুব
কেরামতি ও ধুন্ধুমার
আমরা জানি আমেরিকার হাসি-খুশি প্রেসিডেন
আরবের মরুভূমিতে যুদ্ধ থামাবার জন্য
কুমীরের মতন কাঁদছেন !
আমিরা জানি ভিয়েতনাম নামে একটা দেশ আছে
যেখানে কোনোদিন যুদ্ধ থামে না
আমরা জানি মরিচঝাঁপির হা-ঘরে বাঙালগুলোকে
তাড়াবার জন্য
সরকার-বাহাদুর নিয়েছেন
উপযুক্ত বন্দোবস্ত
আমরা জানি একটা নদীর বুকে সেতু বানাবার জন্য
কোনো এক বড় মন্ত্রী এসেছেন
শিলান্যাস করতে গতকাল
শিলান্যাস ? প্রাইমারির মাস্টামশাই জানে, ওর মানে পাথর
কপাল, এমন কপাল, এদিকে তেমন একটা নদীও নেই
যার বুকে পাথর ছুঁড়ে খেলতে
দেখবো কোনো মন্ত্রীকে !
সকালবেলা আমাদের মুড়ি-পেঁয়াজ খাওয়ার সময়
চমৎকার গান শোনায় কিশোরকুমার
নিতাই গড়াই এমনই শৌখিন যে বাঁশঝাড়ের পেছনে
জলের গাড়ু নিয়ে যাবার সময় সে অন্য হাতে
ঝুলিয়ে নিয়ে যায় ট্রানজিস্টার
আমরা জানি, রাইটার্স বিল্ডিংস, লালবাজার, লাল
কেল্লা, বিমান বাহিনী,

পনেরোই আগস্ট

খবরের কাগজের
স্বাধীনতা, বিল্লা রঙ্গা, ব্যাঙ্ক-
ডাকাতি, রবি ঠাকুরের
গান, পঞ্চম
বার্ষিকী পরিকল্পনা, রেল, পাতাল
রেল, অ্যাটম
বোমা, নক্সাল ছেলেদের জেল
থেকে ছাড়া পাওয়া,
কলকাতা অন্ধকার, বিবিধ
ভারতীতে আমাদের সমস্ত চোখে-না-দেখা জিনিসের বিজ্ঞাপন
দিল্লিতে আন্তর্জাতিক
শিশুবছরের উদ্বোধন...
এইসব ভালো ভালো জিনিস আছে আমাদের দেশে,
আমরা জানি সব জানি
তবু সন্ধেবেলা মোমবাতির আলোয় তাস খেলার বৈঠকে
কিংবা খুড়ো, আমাদের সব্বাইকার খুড়োর কীর্তনের আসরে
হঠাৎ হাট-ফেরতা কেউ
পটাশ-ভেজালের মতন বিশ্ব চমকানো খবর দিয়ে যায় !
রামজীবনপুরের হাট যেন চাঁদ, আমাদের টানে, টেনে রেখেছে
ঐ চাঁদকে কেন্দ্র করে ঘোরে
ঘুরতে থাকে
আমাদের ছোট ছোট নিয়তির বড় বড় চাকা

হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি যেও নাকো
হরিদাসপুরে
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি ঝুলে থাকো
লাউয়ের ডগায়
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি মাসে পাঁচ দিন
কুচো মাছ খেতে ভালোবাসো
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি নিচু মেঘ হও
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি কানু ঘরামিকে
দাও চোখ
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি দুধ হও

চিটে-পড়া ধানে
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি
গোপন আগুন হও
সামন্ত জ্যাঠার বড় লোহার সিন্দুকে
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি কিছু কম করে দাও
রহমান সাহেবের
পাম্পসেট ভাড়া
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি প্রজাপতিটির দিকে
স্থির চোখে অমন চেও না।
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি যাত্রা দেখে
তাড়াতাড়ি
ফিরে এসো বাড়ি
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি রাগী স্ত্রীলোকের হাতে
কখনো দিও না ফলিডল
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি বাঁজা পেঁপে গাছটিকে
একবার ছোঁও
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি রোগা গোরুটিকে দাও
সহজ নিশ্বাস
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি ইস্কুলের ছেলেদের
মুখে দাও ইস্কুলের ভাষা
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি নীল বিদ্যুতের শিখা
দেখে দুই চোখ মুছে নাও
হে জীবন, হে প্রিয় আমার, তুমি কাছে কাছে থেকো।

আমাদের এখানে কোনো বিখ্যাত ভাঙা মন্দির নেই
এখানে ঘটেনি চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ
বরফ কিংবা মাখন কখনো পদার্পণ করেননি এখানে
তবু আমাদের এই গ্রামটি ঐতিহাসিক
এই টোকো আম, ভূতি কাঁঠাল ও জারুল গাছ ঘেরা
লোকচক্ষুর অগোচর পল্লীটি
ছ'সাতশো মানুষ নিয়ে টিকে আছে
হাজার হাজার বছর
এই মেঠো রাস্তা ধরে হেঁটেছেন আমাদের চতুর্দশ পুরুষ
তেঁতুল গাছতলায় শ্মশানে পুড়েছেন আমাদের

বৃদ্ধ প্রপিতামহ
যে আঁতুড়ঘরে আমাদের পঞ্চম সন্তানটি জন্মালো
ঠিক সেখানেই জন্মেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষ
আমাদের শিশুরা মাতৃস্তন্য পান করে না,
তারা নিস্তনী মেয়েদের
বুক কামড়ে কামড়ে খায়
তবু মাতৃ ও ভূমিস্নেহ আমরা পেয়ে যাই উত্তরাধিকার সূত্রে
আমরা সবুজকে হলুদ করি আবার ধূসরকে বলি
সজল হতে
আমরা কেঁচো, গুগ্‌লি, শামুক, ব্যাঙ ও সাপেদের
সামঞ্জস্য ঠিকঠাক রেখে দিয়েছি
আমাদের এখানে নদী নেই, তবু বন্যা এসে যান
সূর্য অতি ক্রুদ্ধ হলে ঢেলে দেন
অতিরিক্ত আগুন
কখনো কখনো হাওয়ায় উড়ে আসে ইস্তাহার
জমিতে প্রোথিত হয় ঝাণ্ডা
আমরা ছেলেবেলার মতন দৌড়োদৌড়ি ও
মারামারির খেলা করি
আবার বিপরীত বাতাসে ভেসে যায় সব কিছু
আমাদের এখানে সব কিছুই, এমনকি ক্ষিদে পর্যন্ত
অত্যন্ত রহস্যময়ভাবে সরল
বীজতলার ওপর লাফালাফি করে গঙ্গাফড়িং
উনুনের ছাই দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে কেউ কেউ
গেয়ে ওঠে গান
হাঁসের ডিমের ঝোল রান্না হলে ছোট ছেলেমেয়েরা
মাটি চাপড়ে খলখল করে হাসে
আমরা আকাশকে রেখেছি নীল
আমরা নীলাভ ছায়ার মধ্যে খুঁজে বেড়াই আমাদের ভ্রমর
আমরা আবহমানকালকে 'দাঁড়াও' বলে
থমকে রেখেছি।

প্রথম লাইন

'চক্ষুলজ্জা' শব্দটি লিখে, একটু ভেবে, আবার কেটে দিই
কেন লিখেছিলাম, নিজেই জানি না
তারপর, শুধুই 'চক্ষু' লিখে, একটুক্ষণ থমকে থাকি,
সেটিকে ঘিরে এঁকে দিই একটি দুর্বল ধনুক
যেন কলমে কালি আসছে না, এইভাবে পাতা জোড়া
আঁকাবাঁকা রেখা
নিজের নাম দিয়ে স্বেচ্ছাচার···
তারপর পাতা উল্টে যাই।
পরর পৃষ্ঠার শুভ্র নগ্নতার কাছে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা
যেন আমি বাজবরণ আঠার সঙ্গে কিছু একটা
উপমা খুঁজছি
যেন বিমান-বন্দর নিঃশব্দ, অথচ কারুর আসার কথা
ছিল এই সময়
যেন বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে প্রতিমার রং
পুরোহিত ধরা পড়েছে খুনের দায়ে···
একটুক্ষণ আনমনা
বাইরের কোনো শব্দ মনোযোগ কেড়ে নেয়
হাতের কলম নিজে থেকেই লেখে, 'ভালোবাসা'
আমি তার সঙ্গে 'র' যোগ করি,
নিজের শূন্য বাঁ ও ডান পাশের দিকে
একবার দেখে নিই দ্রুত
কেউ নেই, পৃথিবী সম্পূর্ণ নির্জন
তখন প্রথম লাইনটি লিখতে আমার আর একটুও
অসুবিধে হয় না :
'ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে···'

ফিরে এসো

পবিত্রতা, বেড়াতে গিয়েছো তুমি
কোন্ দূর নির্বাসনে,
কার হাত ধরে ?

হে হিম নিশীথ, হে জ্যোৎস্না
তুমি এমন নিথর কেন
এখনো বোঝোনি ?
হে প্রেম, হে মৃত স্বদেশের ছায়া
হে শূন্য দেয়াল
বাতাস কুড়িয়ে নেয় স্মৃতি-রেণু অন্যমন ধুলো…
পবিত্রতা, বেড়াতে গিয়েছো তুমি
কোন্ দূর নির্বাসনে
কার হাত ধরে ?
ফিরো এসো
স্বর্গ-নগরীর চাবি
নিয়ে ফিরে এসো ।

আসলে একটিও

আসলে একটিও নারী নেই, সবই নারীর আদল
বহু দেখাশুনো হলো, সকলেই দেখার আড়ালে রয়ে গেল
যেন মেদিনীর নিচে অগ্নিকুণ্ড, অন্য কেউ লিখে
রেখে গেছে
এত ভালোবাসাবাসি হলো, শয্যায় বসন্ত-যুদ্ধ
সব কিছু ধুয়ে দেয় স্বপ্নময় সুগন্ধ সাবান
অচেনা প্রান্তর থেকে ফের শুরু, প্রহেলিকা ভেদ করা ভোর
হাসি ও কান্নার বিপরীত, শরীরের সব চেনা,
তবু বালকের মতো অভিমান
কিছুই মেলেনি
সব ছিন্ন ভিন্ন করে যেতে ইচ্ছে হয়, ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া
নীরব পাহাড়
শুধু কবিতার শব্দ নির্মাণের জন্য নারী
এ অন্যায় কবিকেও মৃত্যুতে অতৃপ্ত রেখে দেয় !

দিন-রাতের মানুষ

দিনের মানুষ সবাই হলুদ, রাতের মানুষ নীল
দিনের মানুষ বিষম ব্যস্ত, হাত পা বাঁধা
রাতের মানুষ নিজের মধ্যে গোলকধাঁধা
দিন-মানুষের সময় খুচরো টাকায় কেনা
রাত-মানুষের সবই উজাড়, বিষম দেনা
এবং তারা পরস্পররের খুব অচেনা,
এইটুকুই যা মিল !

কৌতুক

মেঘের সুপরামর্শে নাবাল জমিতে রোয়া হলো ইরি ধান
তারপর মেঘ উড়ে চলে গেল সুদূর পশ্চিমে
এ যে কৌতুক, যেন অনন্ত আকাশে এক কণা পরিহাস
সবাই বুঝেছে, শুধু একজন বোঝেনি, সে
শিরীষ গাছের কোলে গালে হাত দিয়ে
বসে আছে—
ক্ষয়াটে পাতলা মুখ, পুরোনো শিশির কাচ-রঙা দুই চোখ
চিবুকে জলপাইরঙা দাড়ি আর হাতে পোড়া বিড়ি
উরুর লুঙ্গিতে দ্রুত হেঁটে আসে প্রতিশোধকামী এক
ক্ষিপ্ত কাঠ-পিঁপড়ে
সেদিকে নজর নেই ওর
অসুস্থ শস্যের দিকে চেয়ে আছে, অথচ সে সসব দেখে না
ঘাসের জটলায় যেন লেখা আছে পাম্পসেট ভাড়া
মাটির গহ্বরে থাকে পটাস, ফসফেট, ফের
মাটি তাই খায়
সকলেই খেতে চায়, যেদিকে তাকাও শুধু পাখির ছানার মতো
উৎকণ্ঠিত হাঁ
পিচ্ করে থুতু ফেলে হঠাৎ লোকটা কেন লাফিয়ে
ঘোরতর যুদ্ধে মেতে ওঠে
বাতাস উদ্দাম হয়ে দেখে সেই দৃশ্য
দূরের দূরবীনে দেখে ঠিক মনে হবে

ওটা কোনো যুদ্ধ নয়, নাচ
মাঠের সৌন্দর্যে এক নৃত্যরত কালের রাখাল।

নীরার জন্য

নীরা, তুমি নাও দুপুরের পরিচ্ছন্নতা
নাও রাত্রির দূরত্ব
তুমি নাও চন্দন বাতাস
নাও নদীতীরের কুমারী মাটির স্নিগ্ধ সারল্য
নাও করতলে লেবু-পাতার গন্ধ
নীরা, তুমি মুখ ফেরাও, তোমার জন্য রেখেছি
বছরের শ্রেষ্ঠ বর্ণাঢ্য সূর্যাস্ত
তুমি নাও পথের ভিখারি বালকের হাসি
নাও দেবদারু পাতার প্রথম সবুজ
নাও কাচ-পোকার চোখের বিস্ময়
নাও একলা বিকেলের ঘূর্ণি বাতাস
নাও বনের মধ্যে মোষের গলার টুংটাং
নাও নীরব অশ্রু
নাও মধ্যরাতে ঘুমভাঙা একাকিত্ব
নীরা, তোমার মাথায় ঝরে পড়ুক
কুয়াশা-মাখা শিউলি
তোমার জন্য শিস দিক একটি রাতপাখি
পৃথিবী থেকে সব সুন্দর যদি লুপ্ত হয়ে যায়
তবু, ওরে বালিকা, তোর জন্য আমি এই সব
রেখে যেতে চাই।

মনে পড়ে

মনে পড়ে সেই গান
নিরঞ্জনা নদী-তীরে এপারে ওপারে
সেই সুখ এপারে ওপারে নিরঞ্জনা নদী-তীরে মনে পড়ে
পাতা-ছোঁয়া জল, চাপা জ্যোৎস্না, সেই প্রিয় অলীকের ছবি

মনে পড়ে, এই জন্মে, নিরঞ্জনা নদী-তীরে
এপারে ওপারে, মনে পড়ে ;
সেই ভাঙা ভাঙা হাসি মনে পড়ে, এ রকম পার্থিব নিশীথে ?

অভিশাপ

তুমি তো আনন্দে আছো, তোমার আনন্দ
অন্য বর্ণ
নিরন্তর পাশা খেলা, মাঝে মাঝে শোনা যায় হাসি
তোমাকে দেখে না কেউ, এত গুপ্ত
অন্তরীক্ষবাসী
মনে হয় ।

প্রতিটি জয়ের পর আবার নতুন খেলা
এতো বেশি লোভ ?
তুমি কতদূরে যাবে ? কতো দূরে যাবে ?

দুঃখকে চেনো না তুমি, তোমার দুঃখের
অন্য বর্ণ
মানুষকে ছোট করো, মানুষকে পিঁপড়ে করে মারো
দুর্দিনের সওদাগর, সিন্দুকের মধ্যে তুমি ভরে রাখো
হাজার অসুখ
দ্রব্য থেকে কেড়ে নাও দ্রব্যগুণ
এত অহংকার
আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি হেরে যাবে,
তুমি ঠিক নিজের কাছেই হেরে যাবে !

যোগব্রত

সে চেনা রাস্তা পছন্দ করতো না
সে প্রায়ই আলোকিত পথ ছেড়ে
ছুটে যেত ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে

রক্ষাকালীর পুজোর রাত্রে মুলুটিতে সে এমনভাবেই দৌড়েছিল
যে সে শিখেছে তিরস্কারিণী বিদ্যে
অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে
দু' পাশে নিচু ধান ক্ষেত
সাপের ভয়ে চমকানো আমাদের মুখ
মাথার ওপরের আকাশ মুছে নিয়েছে পৃথিবীকে
কেউ কেউ তার নাম ধরে ডাকলো, কেউ কেউ নিজের নাম ধরে
তারপর কেউ একজন মহাদেব কিংবা চণ্ডালের মতন
ভিজে মাটি থেকে তুলে এনেছিল
তার নিথর উষ্ণ শরীর

একবার সে এক দুর্দান্ত বৃষ্টিভরা রাতে
অমনোনীত করলো সঙ্গী সাথী পথ
শহরকে গ্রাম ভেবে সে চলে গেল নদীর দিকে
খালি রিক্‌শার ওপর পড়ে রইলো এক জোড়া চটি
শহরের দক্ষিণে সে পেয়েছিল বাল্যকাল
শহরের উত্তরে স্বর্গ

একবার চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে সে ছুটে গিয়েছিল
পাহাড়ের দিকে
আর একবার সে ভাঙা প্রাসাদ দেখার জন্য গিয়েছিল সমুদ্রে
অরণ্য ছিল তার খুব প্রিয়, মানুষজন ছেড়ে
বিকেলের দিকে প্রায়ই সে চলে যেত বনে জঙ্গলে
স্নেহ মমতার কাঙাল হয়ে বারবার সে নিজের কাছে ফিরে এসেছে
আমরা জানতাম সে ফিরে আসবে
ফিরে এসে সে ভালোবাসার জন্য গর্জন করবে
হঠাৎ কি সে তিরস্কারিণী বিদ্যে ভুলে গেল
অদৃশ্য থেকে আর দৃশ্যমান হলো না।

অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত

বাঁধের উপর বসে রয়েছে একজন মানুষ
হাঁটুতে মুখ গুঁজে
ঋষিরা তার নাম দিয়েছিল অমৃতের সন্তান
দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চমকাচ্ছে রোদ
আকাশ বর্ণহীন
নদীর যৌবন নেই, দেখা যাচ্ছে তার কালো, নরম তলপেট
আধপাকা ধান এলিয়ে আছে মাঠে
তিল ক্ষেতে থক্‌থক্ করছে শোঁয়া পোকা
এ-সবকিছুরই মাঝখানে বসে আছে সেই অমৃতের সন্তান
তার মুখ তেতো
তার সন্ততিরা গড়াচ্ছে ধুলোয়
তার বীর্যধারিণী খুঁড়ছে কচু গাছের মূল
বৈশাখ মাসের সাত তারিখটি খলিসপুর গ্রামের
সবচেয়ে উঁচু তেঁতুল গাছটায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে
ব্রহ্মদৈত্যের মতন
বিশ্বসংসারে কিছুই থেমে নেই
বিমান উড়ছে
ইথারে ভাসছে সঙ্গীত
নববর্ষের প্রভাতফেরী, কবির জন্মদিনে উন্মাদনা
জলভরা মেঘ শুধু নিরুদ্দেশ
অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত নামের পাড়াগাঁগুলোয়
বাঁধের ওপর বসে আছে বিষণ্ণ মানুষ
তারা কিছু খায়নি, তারা কিছু খায়নি, তারা সারাদিন
কিছু খায়নি।

দূর যাত্রার মাঝপথে

পঁচিশ বছর আগে কোনো এক কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচের
সাদা বাড়িতে আমি থাকতাম।
রেলওয়ে ক্রীপার জড়ানো কঞ্চির বেড়া দেওয়া এক-চিলতে বাগান,
মনে আছে, সব মনে আছে।

বসবার ঘরের দেয়ালে অসংখ্য পেরেক, ক্যালেণ্ডার বা ছবির
তেমন আধিক্য ছিল না
আমার ছোট কাকীমা লাল আকাশের নিচে প্রথম এসেছিলেন
সন্ধেবেলা সেই সাদা রঙের বাড়িতে

পঁচিশ বছরের ঘূর্ণিঝড়ে বদলে গেছে সব পুরোনো স্থান কাল পাত্র
বুড়ো হয়ে গেছে গাছ, বুড়ি হয়েছে নদী
দিগন্ত নিয়ে যারা খেলা করতে ভালোবাসতো, তারা অনেকেই
আজ চলে গেছে দিগন্তের ওপারে
দূর যাত্রার মাঝপথে থমকে গিয়ে আগন্তুক আমি হঠাৎ
দেখি, সেই সাদা বাড়িটির ঝুল বারান্দায়
ঠিক পঁচিশ বছর আগেকার লাল রঙের আকাশকে ঘোমটা করে
আমার তরুণী ছোট কাকীমা প্রথম দিনটিতে হাসছেন।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
নিঃশব্দ রাত্রির দেশ, তার ওপরে একজন নিঃসঙ্গ মানুষ
অদূরে খাজুরাহো মন্দিরের চূড়া
মিথুন মূর্তিগুলো দেয়াল ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠেছে আকাশে
নীল মখমলে শুয়ে নক্ষত্রদের মধ্যে চলেছে শারীরিক প্রেম
আমি যে-কোনো দিকে যেতে পারি
অথচ আমার কোনো দিক নেই!

ভারতরর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম'
সেই দিনটি ছিল বর্ষণসিক্ত
মাঝে মাঝে এমন হয়, আকাশ নিচে নেমে আসে
গাছগুলি দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে, এসো, এসো
বোঝা যায় এখন এই পৃথিবী মানুষের জন্য নয়
বস্তু বিশ্বের মধ্যে রয়েছে গহন কোনো বাণী
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে পায়ের তলার মাটি
এই রকম সময়ে দিক ঠিক করা সহজ নয়
আমি পা বাড়িয়ে থাকি,

কিন্তু কোন্ দিকে যাবো জানি না।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
দিঘির জলে ভাসছে গোলাপি শাড়ি পরা বধূটির শব
তার পায়ের আলতা ধুয়ে যায়নি
তার হাত ভর্তি সবুজ কাচের চুড়ি
তার ওষ্ঠ ও অধর তীব্র বিষের দাহে নীল
যারা সহজে চিৎকার করে তারাও চারদিকে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ
যারা অপরের হাতে নিহত হবার জন্য প্রস্তুত
তারাও আজ একটু একটু খুনী

এই দিঘির কাছে সে প্রত্যেকদিন তার মনের কথা বলতে আসতো
তার তীব্র দুঃখ ছিল না, তার তীব্র সুখ ছিল না
সে শুধু চেয়েছিল মাঝারি ধরনের বেঁচে থাকতে
একটা কোনো জায়গা থেকে তো তার মৃত্যুর জন্য
উত্তর খুঁজে আনতে হবে
কোন্ দিকে ? কোন্ দিকে ?

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপরে দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
ঝাঁসী, হায়দ্রাবাদ, নাগপুর, কানপুর, এলাহাবাদ
বিভিন্নমুখী বাস গোল হয়ে ঘিরে ফোঁস ফোঁস করছে
যে-কোনো একটায় লাফ দিয়ে উঠে পড়লেই হয়
কিন্তু কেন আমি নাগপুর না গিয়ে এলাহাবাদ যাবো না
অথবা হায়দ্রাবাদ না গিয়ে ঝাঁসী না যাবার কোন্ যুক্তি আছে
ঠিক এক জায়গাতেই যাওয়ার গাড়ি-ভাড়া
আমাকে একবারের বেশি দু'বার সুযোগ দেওয়া হবে না
আমাকে পাঠানো হয়েছে মাত্র একটি জীবন কাটাবার জন্য
একটি জেলখানা থেকে বেরিয়ে শুধু একদিকে যাবার মুক্তি
চোখ বুজে ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে শুধু একটি কাগজের টুকরো
আমি চোখ বুজলাম
এইরকম সময়ে মানুষ চোখ বুজে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে
এবং বৃক্ষের মতন স্থাণু হয়।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম

চতুর্দিকে সব কিছুই অচেনা
দু'দিক দিয়ে মানুষ আসে যায়, কেউ থামে না
কেউ চোখের দিকে চোখ ফেলে না
কেউ আমার কথা বোঝে না, আমি কারুর কথা বুঝি না
কারুর হাতে উজ্জ্বল নীল রঙের বল, কারুর হাতে পাংশু রঙের থালা
কেউ মুঠো মুঠো বাতাস খায়, কেউ অ্যালকহল দিয়ে দাঁত মাজে
জীবন্ত যুবতীর বুকে শকুন এসে ঠোকরায়, তারা হাসে,
শিশু এসে মায়ের আদর কাড়তে চাইলে মা কাঁদে
পোশাকের দোকানে মানুষ ঝুলছে, অপর মানুষের কোনো পোশাক নেই
মাংসের দোকানে মানুষ ঝুলছে, অপর মানুষের কোনো মাংস নেই
এই ঘোর অচেনা রাজ্যে আমি একটু দাঁড়াবারও জায়গা পাই না
আমি কি এখানকার কেউ নয়
এ আমার দেশ, এ আমার দেশ বলে চিৎকার করে উঠি
কর্ণপাত করে না একজনও
এমনকি আমার দেশও কোনো উত্তর দেয় না !

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
একটি ঠিকানাহীন চিঠি এসেছে, আমার যেতে হবে
যেমন ভাবে মৃত্যুর নির্ভুল চিঠি আসে
কিন্তু মৃত্যু কারুর জন্য অপেক্ষা করে না, আমার জন্য
একজন প্রতীক্ষায় বসে আছে
সে কোথায় জানি না, সে কি সমুদ্র কিনারে
কিংবা হিমালয়ের মর্ম ছায়ায়
সে কি বন্যায় ধুয়ে যাওয়া মাটির ওপর নতুন পলিতে দাঁড়িয়ে আছে
সে কি শুকনো জিভ বার করে ক্লান্ত জঙ্গলের মধ্যে একাকী শয়ান
সে কি কোনো বিশাল প্লাটফর্মের পাশের জটলার মধ্যে
বসে আছে জানু পেতে
সে আমার ছেলেবেলার হারিয়ে যাওয়া সঙ্গী
সে আমার বড় বড় চোখ
বিস্ময়ের বিমূর্ত ছেলেবেলা
আমি মানচিত্রের গলিঘুঁজির মধ্যে ছোটাছুটি করি
আমায় যেতে হবে, যেতে হবে !

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি

সেই ধানক্ষেতের জায়গায় এখন ধানক্ষেত নেই
সেই নদীর ভিতরে নেই নদী
নগর উড়ে গেছে শূন্যে, সেখানে সব ছাদ-খোলা মানুষ
সেই একই মানুষের মধ্যে অন্য মানুষ
রক্ত ছড়ানো গোধূলি আকাশের নিচে এক অলীক দেশ
একদিন যারা অনুসরণকারী ছিল
আজ তারাই পলাতক
মহাকূর্মের পিঠে এক অন্ধ লিখে যাচ্ছে ইতিহাস
এক জননী তার প্রতিটি সন্তানের জন্য
একটি করে মুর্গীর ডিমও প্রসব করতে পারেনি, এই তার খেদ
যেখানে স্থাপত্য ছিল, সেখানে আজ সুড়ঙ্গ
যেখানেই যাই, সেখানেই শুনি এখানে নয়, এখানে নয়
অথচ কোথাও তো হৃদয় থাকবে এবং তার মধ্যে ভালোবাসা
বিজন নদীর ধার দিয়ে আমি হেঁটে চলেছি
উৎস কিংবা মোহনার দিকে !

বুদ্ধের স্মৃতিতে

অঙ্গুলিমাল, তুমি স্থির হও !
তুমি লোভের তাড়নায় ছুটছো,
আসলে এই নির্লোভ পৃথিবী সব সময় ধাবমান !
অঙ্গুলিমাল, তুমি আমায় ধরতে চাও
আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি।
অঙ্গুলিমাল, তোমার ব্যস্ততায় তুমি অনড়
তুমি পথকে একা অবরোধ করতে চেয়েছিলে
অথচ সমস্ত পথই পথিকের
তুমি কাছে এসো, আমি তোমার জন্য
প্রতীক্ষায় আছি।

যুগ ঘুরে যায়, মানুষের পোশাক বদল হয়
মানুষের বাসনা তবু ভুল হাওয়ায়
ওড়াওড়ি করে।
শৈশবের পবিত্রতা হারিয়ে যায় রুক্ষ প্রৌঢ়ত্বে

আদর্শের ছদ্মবেশ পরে পাশব স্বার্থ
অসংখ্য অঙ্গুলিমাল হিংস্র লোভ নিয়ে
ওৎ পেতে আছে
বিভিন্ন পথের কোণে কোণে
তবুও সহসা চোখে ভাসে সেই সর্বত্যাগী
যুবরাজের মূর্তি
ধীর শান্ত পদক্ষেপে তিনি একা একা চলেছেন
জগতের সমস্ত অঙ্গুলিমালদের তিনি ডেকে বলছেন,
কাছে এসো।

মানস ভ্রমণ

ইচ্ছে তো হয় সারাটা জীবন
এই পৃথিবীকে
এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে যাই দুই
পায়ে হেঁটে হেঁটে
অথবা বিমানে ; কিংবা কি নেবে
লোহা শুঁয়ো পোকা ?
অথবা সওদাগরের নৌকো, যার গলুয়ের
দু'পাশে দু'খানি
রঙিন চক্ষু, অথবা তীর্থ যাত্রীদলের, সার্থবাহের
সঙ্গী হবো কি ?

চৌকো পাহাড়, গোল অরণ্য মায়ার আঙুলে হাতছানির দেয়
লাল সমুদ্র, নীল মরুভূমি, অচেনা দেশের
হলুদ আকাশ
সূর্য ও চাঁদ দিক বদলায় এমন গহন
আমায় ডেকেছে
কিছু ছাড়বো না, আমি ঠিক জানি গোটা দুনিয়াটা
আমার মথুরা
জলের লেখায় আমি লিখে যাবো এই গ্রন্থটির
তন্নতন্ন
মানস ভ্রমণ।

ফেরা

পাহাড় চুড়োয় গড়িয়ে গেল শীতের দুঃখী
বেলা
আমার হলো না আর ফেরা আমার হলো না আর
ফেরা
একলা এক ঘুঘু পাখির নিরুদ্দেশের
মতন
আমার জব্দ হলো ভ্রমণ আমার শব্দ থেমে
গেল
যেন জলের গভীর থেকে দাঁড়ালো এক
স্তম্ভ
আমার মর্ম জুড়ে ছেলেবেলার বর্ণ এবং গন্ধ ছুটে
এলো
ভালোবাসার পিঁপড়েগুলো পোশাক ঢেকে
রাখে
আমার সারা শরীরে সুচ আমার দেখা হলো না
কিছু
রোদের তলায় জ্যোৎস্না ছিল মাটির নিচে
আগুন
আমার লোভের মধ্যে বিষাদ আমার জয়ের মধ্যে
ধুলো
চক্ষে ছিল আঁধার খনি, পায়ের নোখে বিষ
আমার হলো না আর ফেরা আমার হলো না আর
ফেরা।

বন্দী

বাইরে খেলায় মেতেছিল যারা
তারাই আমাকে ছি ছি করে গেল
আমার দু'হাতে শিকল
আমাকে বলল সবাই
—কতকাল তুমি বিকেল দেখনি ?

নারীর হাস্যে আকাশে ছড়ালো ফিকে লাল রং
বন্ধুরা সব নানা উৎসবে মেতে আছে আজ
অথচ আমার দু'হাতে শিকল
আমাকে বলল সবাই
—কতকাল তুমি বিকেল দেখনি ?

হাওয়ায় রয়েছে বারুদগন্ধ, কোথায় এখনও যুদ্ধে চলেছে
অথচ বাইরে সকলেই সুখী, সবারই জামায় আতর গন্ধ
প্রণয়মুগ্ধ শরীর ডুবেছে ঝর্নার জলে
শিশুকে আদর, ছবি ছবি খেলা সকলই রয়েছে

অথচ আমার দু'হাতে শিকল
আমি শুধু এক শাস্তিকালীন বন্দীর মতো
ঘরের দেওয়াল ছোট হয়ে আসে
ঘোর হয়ে আসে নীরব নীলিমা
আমাকে বলল সবাই
—কতদিন তুমি বিকেল দেখনি ?

আগামী পৃথিবীর জন্য

আমরা জানি না
এক শতাব্দী পরেও এ-পৃথিবী বেঁচে থাকবে কি না
আমরা জানি না
মহাপ্লাবনে ভেসে যাবে কি না শেষতম জীবন
আমরা জানি না
সমস্ত সীমাই একদিন হবে কি না হিরোসিমা
আমরা জানি না
হিমালয় আবার ডুব দেবে কি না টেথিস সাগরে
আমরা জানি না
আমাদের সকলেরই নোখ হয়ে যাবে কি না ধারালো ছুরি
আমরা জানি না
ভালোবাসার কথা শুনলেই সবাই বধির ও অন্ধ হয়ে যাবে কি না
আমরা জানি না

মুক্তি শব্দটি শুধু লেখা থাকবে কি না ইতিহাসের পাতায়
আমরা জানি না
ইতিহাস রচনার জন্য থাকবে কি না কোনো ঐতিহাসিক
আমরা জানি না
একদিন শেষ হয়ে হয়ে যাবে কি না সব প্রশ্ন
তবু আমরা এক সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যাবো
আমরা আগামী পৃথিবীর জন্য দিয়ে যাবো আমাদের ঘাম ও অশ্রু
আমরা পরবর্তীদের জন্য রেখে যাবো অন্তত একটি স্বপ্নের উপহার।

মুক্তি

পুরনো জন্মের দিকে দৃষ্টিপাতে হয়তো ভয় পাবো…
একদিন ছিলাম আমি হিংস্র ঊর্ণনাভ অন্ধকারে
হাজার বাসনাসূত্রে, আর বারে বারে লোভী চোখে
মরেছি অনেক মৃত্যু—স্মৃতির নরকে বহুকাল।
মনে পড়ে অরণ্যের আশ্চর্য বিশাল বনস্পতি
আমার আশ্রয় ছিল, স্ত্রী পুত্র সন্ততি দুঃখ সুখ
শাখার নির্ভরে ঢেকে দুঃসাহসে বুক ভরে নিয়ে
বহু রাত্রি পাহারায় দু' চক্ষু শানিয়ে জেগে জেগে
নিশ্বাস নিয়েছি বুকে।

নিশ্বাসে আগুন ছিল, চোখের সম্মুখে কতবার
হা-হা-শব্দে জ্বলে উঠল বাল্য সারাৎসার প্রিয় স্মৃতি
ফেরারী মায়াবী সুখ, প্রেম, পুণ্য, প্রীতি, অহঙ্কার
এইসবই শৃঙ্খল যেন, ভেঙে যায় বার বার গড়ে,
আমার পৃথিবী ঘিরে
ঈশ্বরের পুত্র নই তবু ফিরে ফিরে আসি আমি
দ্বিতীয় ঈশ্বর সেজে, বিভ্রমবিলাসী অন্ধকীট
যে বিশ্বাসে ধরতে চায় সূর্যের কিরীট, তীক্ষ্ণ আলো
আমি সেই বিশ্বাসের সূচীমুখ, নিষ্ঠুর ধারালো স্বাদ নিতে
মৃত্যু নিয়ে খেলা করি এই পৃথিবীতে বহুবার।

প্রতি নেত্রপাত যেন নতুন জন্মের কথা বলে

ধমনীতে রক্তস্রোত উন্মত্ত কল্লোলে বলে যায়
ফিরে আসবো হে মরুৎ, ভুলো না আমায়, হে শূন্যতা-
হে যৌবন, হে রমণী,—অবাচীন কথা বলে যাবে
প্রগল্‌ভ কালের মূর্তি, ক্রমাগত গোপনে পালাবে চুরি করে
জীবনের সীমাচিহ্ন, জাল কণ্ঠস্বরে প্রিয় নামে
ডাক দেবে, তুচ্ছ করো : যেন নীল খামে মিথ্যে চিঠি
নামহীন কেউ লেখে, ভুল ট্রেন সিটি দিয়ে যায়…

আমার অনেক জন্ম, আসলে তো কোনোদিনই মৃত্যুকে দেখিনি
অসংখ্য ছবির মালা যে মায়াবিনী দুরাশায়
ফোটায় স্মৃতির ফুল। ক্রমে বেড়ে যায় রক্তঋণ
পুরুষের চক্ষে জ্বলে ধারালো সঙ্গিন, রমণীর
বক্ষযুগে স্তন্য ক্ষরে, আমার শরীর টুকরো হয়
রক্তস্রোত এক থাকে, দু'হাতে সময় নিঃস্ব করি।

দু'হাতে, শরীরে আমি এই পৃথিবীর সব চাই
অথচ হৃদয় ছিল মুমুক্ষুর
অথচ জয়ের মধ্যে মিশে আছে শোক।

দেখা হবে

রাত্রির সমুদ্রতীরে দেখা হবে রাত্রির সমুদ্র
আর কিছু নয়
জলের কিনার ঘেঁষে জলের গভীর মর্ম ছুঁয়ে
বসে থাকা হবে
শব্দ দেবে প্রতিচ্ছবি বর্ণ দেবে নিবিড় বন্ধুত্ব
স্বপ্নে যে রকম
নীলের সাম্রাজ্যে বাঁধ ভেঙেছে জ্যোৎস্নার অকস্মাৎ
ছুটে গেছে রথ
ঢেউগুলি ক্রমাগত যে স্তব্ধতার ঐকতান
যেমন মেঘেরা
বালির উপর ইচ্ছে হলে অনায়াসে শুয়ে পড়া
ডান পাশ ফিরে
মনে থাকে যেন শুধু ডান পাশ বালির ওপরে

খোলা চুলে হাত
চোখের ওপরে চোখ নক্ষত্রেরা শূন্যে ঝাঁপ দেবে
পৃথিবীরও নিচে
কিছু না বলার ভাষা, গরম ওষ্ঠের শিলালেখ
ঠিক সে সময়
রাত্রির সমুদ্র হবে সশরীর রাত্রির সমুদ্র
হবে, দেখা হবে।

কই, কেউ তো ছিল না

কেউ কেউ ভালোবাসে ভুল করে, কেউ কেউ ভালোই বাসে না
কেউ কেউ চতুরতা দিয়ে খায় পৃথিবীকে, কেউ কেউ বেলা যায়,
ফিরেও আসে না।

ওপরে চাঁদের কাছে মেঘ জমে পাহাড়ের মেষ তৃণে আগুন
লেগেছে
যাদের বাঁচার কথা ছিল, নেই, ভুল মানুষেরা আছে বেঁচে।

স্বপ্ন বারবার ভাঙে, তবু ফের স্বপ্ন উপাদান দেয় অচেনা নারীরা
তাদের গলায় দোলে রক্তমাখা অত্যুজ্জ্বল ধাতুমালা, পান্না কিংবা
হীরা!

আমার যা ভালোবাসা, কাঙালের ভালোবাসা, এর কোনো মূল্য
আছে নাকি?
এ যেন জলের ঝারি, কেউ দেখা দেবে বলে হঠাৎ মিলিয়ে যায়
বাবলা কাঁটার ঝোপে
যেমন জোনাকি!

সুধা ভ্রমে বিষ খাই, বিষ এত মিষ্টি বুঝি? তবে যে সকলে
বলো লোনা?
আমাকে মৃত্যুর হাতে ফেলে ওরা চলে যায়, বারবার
ওরা মানে কারা?
কই, কেউ তো ছিলো না।

বিক্ষিপ্ত চিন্তা

এক

আমার নরক সত্যিই ভালো লাগে না। আমি স্বর্গে ফিরে আসতে চাই।

দুই

এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গার নাম ধলভূমগড়। সেখানে যে যায়নি, সে পূর্ণ মানুষ নয়।

তিন

নারীর অস্থিরতায় হাত রেখে জিভ ছোঁয়ালে পৃথিবী কাঁপে।
আমার পৃথিবী নয়, সেই নারীর পৃথিবী নয়, অলীক ব্রহ্মাণ্ড।
ঘোর অমাবস্যার রাতে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা অনেকটা, না
মরে মৃত্যুর স্বাদ পাবার মতন।

চার

একথা সত্যি, আমরা অনেকেই শ্মশানে অনেক রাত ঘুমিয়ে এসেছি।

পাঁচ

জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের মুখে একজন অন্ধ ভিখারী এক পয়সা ভিক্ষের
বিনিময়ে অমরত্ব দেয়। যার যার অমরত্ব দরকার ওর কাছ থেকে ঘুরে
আসুক।

ছয়

সব দুঃখ পবিত্র নয়, সব স্বপ্ন অপরকে জানাবার মতো নয়, সব রাস্তা
রোমে যায় না, সব প্রেম নারীর প্রতি নয়, সব সাদা কাগজই মলিন হতে
চায় না, সব জানালা খোলা সম্ভব নয়, সব কবিই বিশ্বাসঘাতক নয়।

দীর্ঘ অন্ধকার

দেখ, অন্ধকারে শুয়ে কী বিশাল দিগন্ত মরাল
আমি আসি আলো সাঁতরে, নদীতীরে বিষণ্ণ ধীবর
জাল ফেলে একা, ক্লান্ত, ভয় দেখায় নিশীথ কঙ্কাল
তুমি এসে ডাক দাও, আলিঙ্গনে সৃষ্টি করো ঘর।

বৃষ্টির অজস্র বিন্দু নেমে এসে দিগন্তেরও আনুক সীমানা।
তোমার স্বপ্নের মুখে মুখ রাখলে হাত দেখিয়ে হাসবে দুশো লোক
এরা সব চির-বৃদ্ধ, কালো-ওষ্ঠ, উচ্চনাশা-প্রাণী

ওরা চোখ খুলে থাক, আমাদের অন্ধকার দীর্ঘতর হোক,
দ্বিতীয় জন্মের আগে শিশু হয়ে পৃথিবীকে দেবো হাতছানি।

এসো চোখে চোখে

ভালোবাসা গেছে সুদূর মানস হ্রদে
ভালোবাসা গেছে পাহাড় ডিঙিয়ে পাহাড়ে
ভালোবাসা গেছে বৈশাখী রাতে নীরব নিথর জলে
ভালোবাসা যায় ছায়ার অন্বেষণে।

ভালোবাসা বড় ব্যস্ত ভ্রমণকারী
পায়ের তলায় চাকা, দুটি হাত ডানা
চোখের নিমেষে চোখের আড়াল
হঠাৎ ছদ্মবেশী
শরীর ছাড়িয়ে উঠে যেতে চায় শূন্যে!

ভালোবাসা, তুমি এসো এই শিলাসনে
মাথার ওপরে পারিজাত তরুছায়া
এখানে ঈর্ষা, মান-অভিমান আজও পথ খুঁজে পায়নি
এসো চোখে চোখে শেষতম কথা বলি!

সেই সন্ধ্যা ও রাত্রি

আমার চুলে এখনো মাখা লাল রঙের ধুলো
মনে পড়ে না প্রিয় গোধূলি? নিশ্বাসে সেই হাওয়া
শূন্য মাঠ দু'পাশ দিয়ে ছড়িয়ে আছে
কাশ বনের ছবি-ফোটানো আকাশ
ঠিক সেদিন আমি পেয়েছি মাটির সঙ্গে
সহবাসের সুখ!

সমস্ত রাত উথাল পাথাল
বুকের মধ্যে পাগল পাগল খুশি
এদিকে যাই ওদিকে যাই সবাই চেনা

সমস্ত গান আমার এত আপন !
যেন আমার প্রবাস থেকে বাড়িতে ফেরা
এক জীবন পরে
তাঁবুর পাশে আধ ঘুমন্ত আগুন আর
ঝিঁক চোখের মানুষ
নারীর মতন অন্ধকার একটু দূরে হাতছানিতে ডাকলো
সেদিন আমি পেয়েছিলাম শরীরময়
শ্রেষ্ঠতম সুন্দরের সহবাসের সুখ !

আলাদা মানুষ

এসো, আলাদা মানুষ হয়ে যাই
এসো, সকলকে ডেকে বলি, আমাদের চিনতে পারো কি ?
বহু ব্যবহৃত এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি এক বিষম অচেনা
আবার নতুন করে লেখা হবে সব
সব দৃশ্যপট বদলে নতুন উৎসব শুরু হবে
এসো, অন্য মানুষ হয়ে যাই

এই নদী, এই মাটি বড় প্রিয় ছিল
এই মেঘ, এই রৌদ্র, এই বাতাসের উপভোগ
আমরা অনেক দূরে সরে গেছি, কে কোথায় আছি ?
আমরা সুখের কাছে ঋণী, আমরা দুঃখের কাছে ঋণী
এসো, সব ঋণ বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে যাই
এসো, আলাদা মানুষ হয়ে যাই ।

বারবার ফিরে আসে

বারবার ফিরে আসে, কবিতা, কখনো অসময়ে
ফিরে তাকাবার মতো মুখ নেই
এমন ভিড়ের মধ্যে, অসম্ভব হৈ হট্টগোলে
বারবার ফিরে আসে, কবিতা যখন অন্যমনে
আর সবকিছু দেখি, ওকেই দেখি না

চতুর্দিকে এত হাত, চতুর্দিকে এত বেশি চোখ
ঘূর্ণিঝড়ে শুকনো পাতা আমার অস্তিত্ব
সব কিছু কাছাকাছি, সব কিছু বড় বেশি দূরে
শুধু সে কখন আসে, চলে যায়, বুক চাপা দুঃখ জমে
দুঃখের পাহাড় !

প্রতীক জীবন

প্রতীকের মরুভূমি পায় না কখনো মরূদ্যান
যেমন নারীর নেই আঙুলের ব্যথা কবিতায়
আমার সমুদ্র নেই বিছানায়, শিয়রের কাছে
শান্ত মেঘ
কবিতায় আছে।

বিংশ শতাব্দীর ঠিক মাঝামাঝি ভেঙেছিল ঘুম
গ্রাম্য সোঁদা গন্ধ মাখা ক্ষ্যাপাটে কৈশোর
কেটেছে বাসনা ক্ষুব্ধ মুখ চোরা দিন, প্রতিদিন
অথচ অক্ষরে,শব্দ, ছন্দ মিলে তীব্র প্রতিশোধ
না-পাওয়া নারীর রূপে অবগাহনের উন্মত্ততা
প্রতীক জীবন, নেই মরূদ্যান, জ্যোৎস্নার সমুদ্র, নেই
শিয়রের কাছে শান্ত মেঘ—
কবিতায় আছে।

স্পর্শটুকু নাও

স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ
ছেঁড়া পৃষ্ঠা উড়ে যায়, না লেখা পৃষ্ঠাও কিছু ওড়ে
হিমাদ্রি-শিখর থেকে ঝুঁকে জলপ্রপাতের সবই আছে
শুধু যেন শব্দরাশি নেই
স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ

ভোর আনে শালিকেরা, কোকিল ঘুমন্ত, আর

জেগে আছে দেবদারু বন
নীলিমার হিম থেকে খসে যায় রূপের কিরীট
স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ

বেলা গেল, শোনোনি কি ছেলেমানুষীর কোনো
ভুল করা ডাক ?
এপারে মৃত্যুর হাতছানি আর অন্য পারে
অমরত্ব কঠিন নীরব
'মনে পড়ে ?' এই ডাক কতকাল, কত শতাব্দীর
জলে ধুয়ে যায় স্মৃতি, কার জল, কোন্ জল
কবেকার উষ্ণ প্রস্রবণ
স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ ।

অচেনা দেবতা

বৃক্ষের চূড়ায় তিনি পা দিলেন, একজন আগন্তুক
অচেনা দেবতা
খর রৌদ্র হেমবর্ণ, জামা পরা প্রজাপতি, কাঠবিড়ালীর ঘুম ভাঙে
প্রকৃতি নাম্নী যে নারী অকস্মাৎ কাঁপে তার আধো-জাগা বুক
কিছু কিছু পুরুষেরা সবুজ চেনে না তাই অরণ্যের নীলে
দেবতাটি চোখ মুখ প্রক্ষালন করে নেন, তাঁর ভালো লাগে ।
একজন অচেনা দেবতা এসে স্পর্শ-ধন্য করে যান
পৃথিবীর নীল রমণীকে ।

তিনটি অনুভব

মানুষের মুক্তি চাই, মুক্তিও মানুষকে খুঁজছে
যেমন শ্রদ্ধা খোঁজে শ্রদ্ধেয়কে, প্রেম খোঁজে প্রেমিককে
আর মমতা এখনো খুঁজে খুঁজে মরছে,
কারুকে পায়নি

সে এসেছিল, দেখা হলো না, ফিরে গেল

ঠিক সে-সময়, সেই মুহূর্তে, আয়ুর বিন্দু
আমি গেলাম, দেখা হলো না, ফিরে এলাম।

তোমার শরীরের উত্তাপ
আমার শরীরের উত্তাপ
এইভাবে সবকিছু পুণ্যময় হলো
আমরা স্বর্গ থেকে এসেছি, সেখানেই ফিরে যাবো।

শূন্যে বাজে

শূন্যে বাজে পাগল ডমরু
গেল দিন, সবুজ দ্বীপের প্রিয় দিন
নতুন পথের শেষ অনিত্যে বিলীন
অন্যমনস্কতা মাখা মরু
এই আলো, ছুটে যায় ছায়ার হরিণ
এই ছায়া, অনিকেত তরু
গেল দিন, সবুজ দ্বীপের প্রিয় দিন
শূন্যে বাজে পাগল ডমরু !

ঝড়

ঝড়ের ঝাপটায় উল্টে গেল একটি ঘুঘু পাখি
সে ঝড়কে ডেকেছিল
ঝড়ের ভালোবাসায় জেলেদের গ্রামটিতে আছড়ে পড়লো সমুদ্র
সমুদ্র ঝড়কে ডাকে
পার্কের পাথরের মূর্তি অন্ধকারে দু'হাত তোলে
শুকনো পাতারা জাড়ো হয় তার পায়ের কাছে
কানাকড়ির মতন পথের শিশুরা এদিক ওদিক দৌড়ে যায়
মাটি কাঁপে, মাটি কাঁপে
মাটি ফিসফিস করে কথা বলে, ঘুমন্ত ভিখারিণীটি শোনে
ফুলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে অভিভূত কীট
কেউ বাজায় না, তবু বেজে ওঠে বাঁশি

রবীন্দ্রনাথের ছবি ঝনঝন করে ছিটকে পড়ে মোজাইক মেঝেতে
তিনি ঝড়ের গান গেয়েছিলেন !

সোনার মুকুট থেকে

সূচিপত্র

সোনার মুকুট থেকে ২১৩, অসমাপ্ত কবিতার ওপরে ২১৩, যে জানে না, যে জেনেছে ২১৪, নিসর্গ ২১৫, অন্তত একবার এ জীবনে ২১৬, বিপদ সীমার ঠিক ধার ঘেঁষে ২১৭, জলের দর্পণে ২১৮, অ ২১৮, কল্যাণেশ্বরী বাংলোয় ২১৯, মনে পড়ে না ? ২২০, বন্ধু-সম্মিলন ২২১, মিথ্যে নয় ২২২, অপরাহ্ণে ২২৩, খণ্ড ইতিহাস ২২৩, আত্মপরিচয় ২২৪, একমাত্র সাবলীল ২২৫, ডাক শোনা যাবে ২২৫, প্রতীক্ষায়, প্রতীক্ষায় ২২৭, অন্য ভাষ্য ২২৭, নীরা, তুমি···২২৮, কে ? ২২৯ মুহূর্তের অস্থিরতা ২৩০, মাত্র এই এক জীবনে ২৩০, একটি প্রার্থনা-সঙ্গীত ২৩১, মধ্যরাত্রির নিরালায় ২৩২, জনমদুখিনী ২৩৩, সমূহ অতল ২৩৩, কাব্যজিজ্ঞাসা ২৩৪, চেনা হলো না ২৩৪, নীল হাত ২৩৬, ভোরবেলার মুখচ্ছবি ২৩৭, খিদে-তেষ্টা ২৩৭, বিরহিণীর শেষ রাত্রি ২৩৮, একটা দুটো ইচ্ছে ২৪০

সোনার মুকুট থেকে

একটুখানি ভুল পথ, অনায়াসে ফিরে যাওয়া যেত
আকাশে বিদ্যুৎদীপ্তি, বুক কাঁপানোর হাতছানি
এই কামরাঙা গাছ, নীল-রঙা ফুল, সবই ভুল
হে কিশোর, তবু তাই হলো এত প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি…

কিছুটা জয়ের নেশা, কিছুটা ভয়ের জন্য দ্রুত ছদ্মবেশ
মৃত চিঠি পড়ে থাকে কালভার্টে নর্দমার জলে
স্বপ্নে কত একা ছিলে, স্বপ্ন ভেঙে মূর্খের মিছিলে
হে কিশোর, সেই অসময় নিয়ে খেলা হলো প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি…

নদীর নারীরা সব ফিরে গেছে, পড়ে আছে নদী
অথবা নারীরা আছে, নদী খুন হয়ে গেছে কবে
যা কিছু চোখের সামনে, বাদ বাকি আঁধার বিস্মৃতি
প্রত্যক্ষের সিংহদ্বার, হে যৌবন হলো এত প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি…

যে দুঃখ বোঝে না কেউ তার অশ্রু মরকতমণি
শেষ বিকেলের মৃদু-আলো-মাখা-ঘাসে পড়ে আছে
নির্বাসন ছিল বড় মধুময়, মন-গড়া দ্বীপে
প্রেম নয়, হে যৌবন, প্রতিচ্ছবি হলো এত প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি…

অসমাপ্ত কবিতার ওপরে

অসমাপ্ত কবিতার ওপরে ছড়িয়ে আছে ঘুম
চুলগুলি এলোমেলো
যেন সে আদর চায়
কবিতার কাছে চায় কিছুটা উষ্ণতা
গুটিসুটি শরীরটি ছোট হয়ে আছে

কেমন করুণ ক্লান্ত, ঘুমের প্রাঙ্গণে অসহায়
সেই কবি !

সারারাত জ্বলে থাকে আলো
জানলার ঝিল্লিতে ঝরে অভ্রফুল, তুষারের মতো
সাজানো অক্ষরগুলি চেয়ে থাকে, দ্যাখে
রেফ্ ও র-এর ফুট্‌কি, তাদেরও বলার আছে কিছু
আর সব ঠিক থাক
মানুষ মিলিয়ে যাক মানব সমাজ
পৃথিবী নিজস্ব মতে ছুটুক উন্মুক্ত বায়ুযানে
একজন কবি শুধু অসম্পূর্ণ
কবিতার খাতা খোলা, পাশে তার ঋণী মুখখানি
তার দুঃখ স্পষ্ট চেনা যায়
লেগে আছে ঠোঁটে ও কপালে ।

যে জানে না, যে জেনেছে

যে কিছুই জানে না সে সব-কিছু ভাঙে
যে জেনেছে, সেও তো ভেঙেছে, আর কোনো কিছু না পেলেও,
জল

অন্ধকার নদীতীরে শ্মশান শিখরে সমুজ্জ্বল
কালপুরুষের অসি, দূরে কোন্ রমণীর হাসি
যে কিছুই জানে না সে তাও ভেঙে দেয়
যে জেনেছে, সেও তো ভেঙেছে, আর কোনো কিছু না পেলেও,
ছবি

ঘূর্ণিঝড় নিমরাজি নৌকোখানি ডুব দিয়েছিল ভরা গাঙে
এক পারে মৎস্যকন্যা, অন্য পারে মরা লখিন্দর
চৈত্রের দিনান্তে সেই ছন্নছাড়া বেলা
যে কিছুই জানে না সে নদীটির দুই কূল ভাঙে
যে জেনেছে, সেও তো ভেঙেছে, আর কোনো কিছু না পেলেও,
বেহুলার ভেলা

তারপর স্তব্ধতায় দেখা যায় না, শুধু শোনা যায় কণ্ঠস্বর
স্পর্শে টের না পেলেও বোঝা যায় দূরে কাছে আছে যে সবই
যে কিছুই জানে না সে তখনো নেশায় ভেঙে যায়
যে জেনেছে, সেও তো ভেঙেছে, আর কোনো কিছু না পেলেও,
প্রেম।

নিসর্গ

পাতা পোড়া গন্ধ পায় না পাতা-পোড়ানীরা
ঝুলি ঝুলি অন্ধকারে পাথরের মুখ বসে থাকে
বনস্থলী কথা বলে
ঘুম ভাঙে ফুলের সংসারে

এ বছর শীত কিছু বেশি।

রাজ্যহীন রাজা যেন বসে আছে একলা ভিমরুল
অদৃশ্য নদীর খাতে পড়ে আছে নদীটির নাম
টিয়া পাখিনীটি তার পুরুষের বুক ঘেঁষে
নেয় মৃদু আঁচ
নীরবতা গ্রীবা তুলে চেটে খায় হিম।

ধোঁয়ার ভেতর থেকে ছিট্‌কে ওঠে টুকরো জবাফুল
অতিথিবৎসল গাছ সংহারের দৃশ্যটিকে দেখে
যার যার ভালোলাগা,
যার যার আলাদা সুন্দর
ভিন্ন ভাষা, দুঃখ ভালোবাসা।

এই যে এখানে বসা গুটিসুটি কয়েকটি মানুষ
অবয়ব স্পষ্ট নয়, আগুনের রং মাখা চুল
পুরুষেরা ধরে আছে রুক্ষ হাঁটু,
উঁচু স্তনে চেনা নারী
শব্দ নেই, ঘ্রাণ, রূপ নেই।
ভোরের ফ্যাকাসে আলো নিয়ে এলো পৃথিবীর খিদে

মাটির গহ্বরে জাগে সাজ-সাজ রব
মানুষেরা উঠে যাবে
মিশে যাবে গাঢ়তম বনে
এইবার শুরু হবে খেলা।

অন্তত একবার এ জীবনে

সুখের তৃতীয় সিঁড়ি ডান পাশে
তার ওপাশে মাধুর্যের ঘোরানো বারান্দা
স্পষ্ট দেখা যায়, এই তো কতটুকুই বা দূরত্ব
যাও, চলে যাও সোজা!

সামনের চাতালটি বড় মনোরম, যেন খুব চেনা
পিতৃপরিচয় নেই, তবু বংশ-মহিমায় গরীয়ান
একটা বড় গাছ, অনেক পুরোনো
তার নিচে শৈশবের, যৌবনের মানত্-পুতুল
এত ছায়াময় এই জায়গাটা, যেন ভুলে যাওয়া স্নেহ্
ভুল নয়, ছায়া তো রয়েছে।

সদর দরজাটি একেবারে হাট করে রাখা
বড় বেশি খোলা, যেন হিংসের মতন নগ্ন
কিংবা জঙ্গলের ফাঁসকল
আসলে তা নয়, পূর্বপুরুষদের দীর্ঘ পরিহাস
লোহার বল্টুতে এত সুন্দর সাজানো, এত দৃঢ়
আর বন্ধই হয় না!
ভিতরের তেজী আলো প্রথমে যে সিঁড়িটা দেখায়
সেটা মিথ্যে, দ্বিতীয়টি অন্য শরিকের
বাকি সব দিক, বলাই বাহুল্য, মেঘময়।

মনে করো, মল্লিকবাড়ির মতো মৃত কোনো গথিক স্থাপত্য
ভাঙা শ্বেত পাথরেরা হাসে, কাঠের ভিতরে নড়ে ঘুণ
কত রক, পরিত্যক্ত দরদালান, চামচিকের থুতু
আর কিছু ছাতা-পড়া জলচৌকি, ঐখানে

লেগে আছে যৌনতার তাপ
ঐখানে লেগে আছে বড় চেনা নশ্বরতা
তবু সব কিছু দূরে, ছোঁয়া যায় না, এমন অস্থির মনোহরণ
মধ্যরাতে ডাকে, তোমাকে, তোমাকে !

দুপুরেও আসা যায়, যদি ভাঙে মোহ
অথবা ঘুমোয় ঈর্ষা পাগলের শুদ্ধতার মতো
তখন কী শান্ত, একা, হৃদয় উতলা
হে আতুর, হে দুঃখী, তুমি এক-ছুটে চলে যাও
ঐ মাধুর্যের বারান্দায়
আর কেউ না দেখুক, অন্তত একবার এ জীবনে ।

বিপদ সীমার ঠিক ধার ঘেঁষে

বিপদ সীমার ঠিক ধার ঘেঁষে পা ঝুলিয়ে
বসে আছে দুটি ছেলে মেয়ে
ভারসাম্য বাঁধা আছে একটিমাত্র চুলে
তবু ছলচ্ছল হেসে ওরা কেন
আকাশ সাঁতরায় ?

ঝড় নয়, পাখি উড়ে গেলে
যেটুকু বাতাস কাঁপে তাও যেন বেশি
পৃথিবীর রোদ-বৃষ্টি ভাগাভাগি হয়ে গেছে কবে
সব ভূমি রক্ত মাংসে গাঁথা
নেহাত আকাশ ছাড়া আর কোনো উদ্যানের
অবিঘ্নতা নেই
তবু ওরা চুলে বাঁধা ভারসাম্যে দোল খায়
সকৌতুক মুখ দুটি শিল্প হয়ে ওঠে
মহাকাল ব্যগ্র হয়ে দেখে
দেখে যে আশ্ মেটে না
চক্ষে লাগে দুঃখের কাজল ।

জলের দর্পণে

মাথার ভিতরে এক কালো দিঘি অতিকায় জলের দর্পণ
স্তব্ধ, স্থির, নিবাত নিষ্কম্প, শুধু
রাজহংসীটির ছেলেখেলা
কোনাকুনি জলকে দু'ভাগ করে চলে যায়
খুব কাছে ঝুঁকে পড়ে মেঘ
রাজহংসীটির এই রমণীয় একাকিত্ব
মেধার গহনে আনে তাপ
জল ভাঙে, জলের ভিতরে ছবি ভেঙে যায়
মেঘের সারল্য সব ঈর্ষা মুছে বলে
সুন্দর সুন্দরতর হতে পারে
মহত্ত্বও আরও মহীয়ান
এইসব কিছুই চাক্ষুষ নয়, জলের ভিতরে
যেন এই পৃথিবীতে দেখা এক অলীক পৃথিবী ।

অ

কে যে মনীশকে ডাকলো, মনীশের জাগরণ ভেঙে
তবু ভালো, শোনার মতন কেউ নেই
সকলেই ঘোর অমাবস্যা দেখতে গিয়েছে সমুদ্রে
মনীশেরও পোশাকের মধ্যে আছে অতিশয় শশব্যস্ত অ-মনীশ
তার বন্ধু অ-অরুণ, অ-সিদ্ধার্থ
অ-লাবণ্য এরাও গিয়েছে

কে যেন মনীশকে ডাকলো, মনীশের জাগরণ ভেঙে
অ-ভালোবাসায় মগ্ন ওরা সব,
সকলেই এক হয়ে আছে
এ ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখে বাকিটুকু চুনকাম হয়
ঘর-বাড়ি ভেঙেচুরে সর্বস্ব নতুন
অ-ব্যবহৃত ক্রেন অমানুষ হয়ে উঁকি মারে

কে যেন মনীশকে ডাকলো মনীশের জাগরণ ভেঙে ?

মনীশ, মনীশ, এসো, টেলিফোন, দূর থেকে কেউ…
অ-মনীশ ছুটে এলো,
কার জন্য ? ও আমার নয় !

অ-লেখা চিঠিও ফিরে যায়, যেরকম অ-দেখা স্বপ্নের বর্ণচ্ছটা
ও আমার নয়, এই অসময়ে কেউ ডাকবে না
বস্তুত ঘুমই হয়নি কয়েক রাত, অতিক্রত চল্‌ছে মেরামতি
কালই একটা কিছু হবে। সকলেই তৈরি থাকো,
তৈরি হও, কাল
আগামী কালের জন্য অপেক্ষায় আছে এই
জীবনের অ-বিপুল অ-পূর্ণতা

অ-মনীশ গেছে তার অ-বন্ধু ও অ-বান্ধবী
সকলের কাছে
কে যেন মনীশকে ডাকলো মনীশের জাগরণ ভেঙে ?
ও আমার নয়, এই অ-সময়ে কেউ ডাকবে না।

কল্যাণেশ্বরী বাংলোয়

এই নিস্তব্ধতা বড় তীক্ষ্ণ, যে শব্দভেদী, যে প্রেমহীন
মানুষের কাছাকাছি মানুষের বিকিরণ টের পাওয়া যায়
এখানে মানুষ নেই, বৃক্ষ-সমাজের থেকে এত বেশি নিশ্বাসের হাওয়া
আমাকে একলা নিতে হবে, সতেরো জনের খুশি হবার মতন
পাখিদের ডাকাডাকি আমার একার জন্য,
এতদূর আকাশ সীমানা
অনায়াসে দুঃখী মানুষেরা মিলে ভাগ করে নেওয়া যেত,
এত আলো, এত নীল অন্ধকার, আমাকে বিপুল ধনী করে দেয়
এত বিলাসিতা যেন আমার সাজে না !

বৃদ্ধ চৌকিদার গেছে বরাকরে, রাতে সে ফিরবে না
আমার রাজত্বে আজ আমিই রাজা ও প্রজা, সঙ্গে আছে
দুটি হাত, দুটি পা ও কুড়িটি আঙুল
একুশটিও বলা যায়

তাছাড়া অজস্র পক্ষপাত, রোমকূপ, ছটি প্রিয় বন্ধু ইন্দ্রিয় এবং
ছ'রকম রিপু
তবু একাকিত্ব হয় সভাপতি, বাকি সব অস্পষ্ট নীরব
এমন নির্জনে আমি সহসা ভয়ার্ত হয়ে উঠি,
নিজেকেই ভয়, আর কাকে ?

এমন নিবিড়ভাবে নিজের সান্নিধ্যে নিজে দেখা হলে
পাথরের বিশুদ্ধতা ভেঙে যায়, ভেঙে যায় নদীর গরিমা
কীর্তি মাথা নিচু করে, ভুল স্বর্গ নেমে আসে কাছে
কত না জবাবদিহি, কত অনিত্যের শিহরন
তার চেয়ে স্মৃতি ভালো
তার চেয়ে নারীদের রূপ রোমন্থন করা ভালো
অথবা উলঙ্গ হয়ে বারান্দায় রাত্রি প্রকৃতির মধ্যে মিশে যাওয়া ভালো।

মনে পড়ে না ?

আপাতত বিশ্বশান্তি, একঘণ্টা চব্বিশ মিনিট
তীব্র নীল আলো ফেলে
উড়ে গেল অন্যদেশী পাখি
তুমি বসে থাকো, তুমি চোখ নিচু করো

শান্ত চেয়ারের পাশে লাল ছাতা, চটি জোড়া
দরজার কাছে
তোমার হাতের রোদ মুখের সমুদ্রে খেলা করে।

কিছুক্ষণ আমার আমিত্ব যাক মধ্য এশিয়ায়
আমি কেউ নই, আমি তৃষ্ণার্ত সন্ন্যাসী
তুমি ডান হাত তোলো আঙুলে জ্বালাও দীপাবলী
সকলেই জানে আমি অগ্নিভুক, অনায়াসে দিতে পারো
যত আছে যুদ্ধের বারুদ
তুমি বসে থাকো, তুমি চোখ নিচু করো
পায়ের পাতার কাছে গালিচার মতন আকাশ।

ভালোবাসা কিছু নয়, তার জন্য আছে দুঃসময়

চতুর্দিকে ভারি ভারি স্তম্ভ, তার ফাঁকে ফাঁকে
চড়ুইয়ের বাসা
দেখেছি অনেক দয়া, দেখেছি মৃত্যুর পরিহাস
এত মেঘ, এত মেঘ, জীবন জড়িয়ে আছে
রূপক মেঘেরা

বিদ্যুৎ চমক, শোনো, শব্দ শোনো একঘণ্টা চব্বিশ মিনিট
একটি নিশান, শুভ্র, নিয়ে আসে চোখের দেবতা
আর সব থেমে আছে, আলো-অন্ধকার মিশে আছে
তুমি বসে থাকো, তুমি চোখ নিচু করো
এতদিন পর দেখা, মনে কি পড়ে না কিছু, নীরা ?

বন্ধু-সম্মিলন

বন্ধু-সম্মিলন ছিল কাল মধ্যরাতে
চাঁদের পাড়ায় খুব গণ্ডগোল, পরীরা সবাই নিরুদ্দেশ
নদীর কিনার ঘেঁষে বাঁধা নীল তাঁবু
আমাদের ছেলেবেলা, আমাদের পাগলামির
সোঁদা গন্ধ মাখা
বাতাস উনপঞ্চাশ, দিগন্তের ওপারে আকাশ

আমাদের পদধ্বনি শুনে থেমে যায় ঝিল্লিরব
আঁধার উজ্জ্বল হলো আমাদের নিজস্ব মশালে
শরীরের রোমহর্ষ, প্রথম শীতের স্নিগ্ধ স্বাদ
পুরোনো কালের সেই শতরঞ্জি, খুবই যেন
চেনাশুনো ধুলো

বহুদিন পর দেখা, হাসাহাসি ভুরুর তলায়
কথা নেই, সকলেই সব জানি, নীরবতা ছিল মধ্যমণি
বন্ধু-সম্মিলন ছিল কাল মধ্যরাতে ।

মিথ্যে নয়

কবিতার সার কথা সত্য, অথচ কবিরা সব
মিথ্যুকের একশেষ নয় ?

নীরার গলায় আমি কতবার দুলিয়েছি উপমার মণিহার
ভোরবেলা
নীরার দু'হাতে আমি তুলে দিই
শিশির-মাখানো সাদা ফুল
ফুলগুলি জাদু সরঞ্জাম যেন
হঠাৎ অদৃশ্য হতে জানে
কতকাল ফুল ছুঁইনি, আঙুল পোড়ায় সিগারেট ।

বিশুদ্ধ পোশাক পরা আমি এক ফুলবাবু
সন্ধেবেলা ফুরফুরে বাতাসে
বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মেতে থাকি তর্কে ও উল্লাসে ।
সেই আমি মধ্যরাতে কবিতার খাতা খুলে
নির্জন নদীর ধারে একাকী পথিক
হাত দুটি যুক্তি-ছেঁড়া রূপের কাঙাল ।

আমার কাঙালপনা দুর্লভ দু'একদিন
নীরাকেও করে তোলে
কিছু দয়াবতী
তীর্থের পুণ্যের মতো সামান্য লাবণ্য ছুঁয়ে দেয়
তীর্থের পুণ্যের মতো ? তার চেয়ে কম কিংবা
বেশি নয় ?
রত্ন-সিংহাসন আমি এ-জন্মে দেখিনি একটাও
তবুও নীরার জন্য বৈদূর্যমণির সিংহাসন আমি
পেতে রাখি
যদি সে কখনো আসে, সেখানে সে বসবে না
জলে-ভেজা একটি পা
শুধু তুলে দেবে ।

মিথ্যে নয়,

নীরা, তুমি জেনে রাখো, সেরকমই সাজানো রয়েছে।

অপরাহ্ণে

তোমার মুখের পাশ কাঁটা ঝোপ, একটু সরে এসো
এপাশে দেয়াল, এত মাকড়সার জাল !
অন্যদিকে নদী, নাকি ঈর্ষা ?
আসলে ব্যস্ততাময় অপরাহ্ণে ছায়া ফেলে যায়
বাল্য প্রেম
মানুষের ভিড়ে কোনো মানুষ থাকে না
অসম্ভব নির্জনতা চৌরাস্তায় বিহ্বল কৈশোর
এলোমেলো পদক্ষেপ, এতদিন পর তুমি এলে ?
তোমার মুখের পাশে কাঁটা ঝোপ, একটু সরে এসো !

খণ্ড ইতিহাস

মাঠের ভিতরে এত পরিশুদ্ধ ঘর বাড়ি, এসব কাদের ?
কাঠবিড়ালি ও ভোমরা, সদ্য-বিবাহিত পাখিদের !
মাঠের কি স্মৃতি নেই, মনে নেই তার বাল্যকাল
এইখানে শুয়ে ছিল বাপ-মা-খেদানো এক
উদাসী রাখাল
কিছুটা জঙ্গলও ছিল, পাতা-ঝরা গান হতো শীতে
একটি জারুল সব লিখে গেছে আত্মজীবনীতে।

পাথর-পূজারী এক সন্ন্যাসীর স্বপ্ন ছিল, ঘুম ছিল,
দুঃখ ছিল বেশি
জ্যোৎস্নার মতন হাসি সঙ্গিনীটি বিশ্বাসঘাতিনী এলোকেশী !
সেই পাথরেরও ছিল অনেক জমানো গুপ্ত কথা
পিঁপড়েরা সব জানে, মাটির গভীরে আজও জমে আছে
ওদের ভাষার নীরবতা…

এসবই পুরোনো ইতিকথা, সেই দুঃখী সন্ন্যাসীর বংশধর

এখন তোফায় আছে, পগেয়াপট্টির এক নিত্য
সওদাগর
রাখালেরও উত্তরাধিকার আছে, রাজমিস্ত্রি,
মজুর, জোগাড়ে
লাল-নীল-সোনালী হর্ম্যেরা জাগে কয়েকটি
মহিষ রুক্ষ ঘাড়ে
প্রতিটি জানলায় পর্দা, বারান্দায় ডালপালা
মেলে আজও রয়েছে প্রকৃতি
কাঠবিড়ালিরা ঘোরে সাইকেলে, ভোমরার গুঞ্জনে রাষ্ট্রনীতি
পাহাড়ের পাঁজরা ভাঙা মোরামের রাজপথ, আর কিছু
খুনসুটি গলি
সংসারী পাখিরা ছোটে ভোরবেলা, ঠোঁটে ঝোলে
বাজারের থলি।

আত্মপরিচয়

আমাকে চিনতেন তিনি, দেখা হতে বললেন, কে তুমি ?
তখন বিকেল ছিল নদীর উড়ন্ত বুকে ঝুঁকে
আমি বললুম, সেই বারুদ-ঝড়ের দিনে একলা
ধানক্ষেতে যে সহাস্যে শুয়ে ছিল রক্তমাখা মুখে
আমি তারই বিদেশী যমজ।

তাঁর কালো আলখাল্লায় সোনালী রোদের বাঁকা সুতো
দাড়ির জঙ্গলে জ্বলে শতাব্দী ছাড়ানো দুই চোখ
পাহাড়ী গ্রীষ্মের হাওয়া হাসলেন দিগন্ত উড়িয়ে
বললেন, শোনো হে, তুমি, ভাই-বন্ধু যে হোক সে হোক
বলো দেখি, পিতা কে, মাতা কে ?

তখন আকাশ হলো রাত্রিমুখী, নদী দিল ডুব
খরোষ্ঠী লিপির টানে মৃদু হাস্যে জানালুম তাঁকে
আমার জন্মের কোনো দায় নেই, যেরকম উট্‌কো পরগাছা
শ্মশানের ঝাড়ুদার বাপ আর শকুনেরা ছিঁড়ে খায় মাকে
তবু আমি সত্যের জারজ !

একমাত্র সাবলীল

এই সাবলীলতার কাছে তুমি হাঁটু মুড়ে বসো
আর সবই জটিল, অলীক
মানুষের কাছাকাছি মানুষের দূরত্ব গহন
হাতে কিছু ছোঁয়া যায় না, চোখ দিয়ে
দেখা যায় না কিছু
একমাত্র সাবলীল, যার ধ্বনি মাতৃগর্ভ জানে।

পিঁপড়ে জানে, পাখিরাও জানে
বুড়ো ঘোড়া পাহাড়ের প্রান্তে গিয়ে চোখ বুজে শোয়
আকাশে দেবতা নেই, জলে নেই জীবন্ত ঈশ্বর
নশ্বরতা শব্দ করে, বাতাস অগ্রাহ্য ভাবে
অভিমানহীন চলে যায়…
সেই সাবলীলতার কাছে তুমি হাঁটু মুড়ে বসো
সেই সাবলীলতার কাছে থাক নির্জন বিশ্বাস
সেই সাবলীলতার কাছে থাক আত্মপ্রেম-রতি
জীবন দু'দিকে যায় নিজের নিয়মে।

ডাক শোনা যাবে

এই সুখ কে এনেছে
তাকে তুমি মৃত্যুদণ্ড দাও !

এই ছিটে-বেড়া-দেওয়া বাড়ি
কে ছিল এখানে
শিউলি গাছটি আজ হিম ঝড়ে নত
সে কি জানে ?
এত এলোমেলো পদাঘাত
তুমুল শৈশবে
দু'হাতে বারুদ মেখে খেলা
শেষ হলো কবে ?
সবুজ দিঘির পাশ ধুলো-মাখা-হাঁস

হংসীটিও কালো
বাতাসে পরাগ-গন্ধ, মাদক-বাতাস
কোথায় হারালো ?
সেই প্রেম
স্তন ছুঁয়ে ফুলের আদর
উরুর গরম থেকে বুক-কাঁপা রোদ
জ্যোৎস্না-মাখা ঝড় !
সেই চিঠি, হাসির মুকুট
ভয়-ভাঙানোর অবলীলা
আকাশে উড়ন্ত প্রিয় গন্ধ
সব দুঃখ অন্তঃসলিলা ।

॥ ২ ॥

এই সুখ কে এনেছে
তাকে তুমি মৃত্যুদণ্ড দাও ।

সহসা ভেঙেছে যারা পাথরের ঘুম
বজ্রমুঠি লোহার আগুনে
তাদের বুকের মধ্যে জমেছে পাথর
শব্দ গুনে গুনে ।
সার্থকতা বিমানের সিঁড়ি
ছাপার অক্ষরে ভালোবাসা
যেখানে হৃদয় ছিল, আজ
অচেনা বন্ধুরা খেলে পাশা
সেই নারী উষ্ণ সশরীর
অন্ধ খোঁজে তাকে
শীতের পাখিরা আসে পথ ভুলে
প্রবল বৈশাখে ।
এই সুখ, এই সে ঘাতক
তুলে নাও ছুরি
রক্তস্নানে যদি দ্বিধা হয়
অন্য হাতে ভুলের মাধুরী ।
চোখে চোখ, বুকে বুক আর

ওষ্ঠে গোলাপের ওষ্ঠ দিয়ো
অন্তরীক্ষে ডাক শোনা যাবে
রোমিও ! রোমিও !

প্রতীক্ষায়, প্রতীক্ষায়

বিশ্বাসই হয় না যেন এতদিন কেটে গেছে
এই তো সেদিন দেখা হলো
মোড়ের দোকানে এসে দুটি সিগারেট ধার, মনে নেই ?
বৃষ্টি ভেজা হাঁটা পথ, চতুর্দিকে কত চেনা বাড়ি
যখন যেখানে খুশি যাওয়া যায়, বাদলের ছোড়দিকে
অনায়াসে বলা যায় শার্ট খুলে
একটা বোতাম একটু লাগিয়ে দিন না
এই তো সেদিন মাত্র দুপুরে জিনের পাঁট হাতে নিয়ে
অকস্মাৎ শক্তি উপস্থিত
চোখ টিপে বলে উঠলো, অফিসের বেয়ারাকে দিতে বলো
দুটো খুব ছোট ছোট নীল-রঙা গ্লাস
চায়ের দোকানে এসে প্রণবেন্দু শোনাতো পেলব স্বরে নতুন কবিতা
শরতের সঙ্গে ঝাড়গ্রাম আর সমীরের উপহার
নতুন চাইবাসা
ঠিক যেন গতকাল, বন্ধুদের পাশ ছেড়ে,
নিঃশব্দে পালাতুম মানিকতলায়
এবং এক পা তুলে ফুটপাথ প্রতীক্ষায় কেটে যেত
দণ্ড পল, অনেক প্রহর
গানের ইস্কুল থেকে যদি কেউ আসে, যদি
একবার চোখ তুলে চায়
আজও যেন রয়ে গেছি প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায়
যদি দেখা হয় !

অন্য ভাষ্য

প্রতিটি ব্যর্থ প্রেমই আমাকে নতুন অহংকার দেয়

আমি মানুষ হিসেবে একটু উঁচু হয়ে উঠি
দুঃখ আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নোখ পর্যন্ত
ছড়িয়ে যায়
যেন ভোরের আলোয় নদীতে স্নানের মতন স্নিগ্ধ
সমস্ত মানুষের চেয়ে আমি অন্য দিকে
আমার আলাদা পথ
আমার হাতে পৃথিবীর প্রথম ব্যর্থ প্রেমিকের উজ্জ্বল
পতাকা
সার্থক মানুষের অশ্লীল মুখ আমাকে দেখে ভয় পায়
আমি পথের কুকুরকে বিস্কুট কিনে দিই,
রিক্সাওয়ালাকে দিই সিগারেট
যীশুর মাথা থেকে খসে পড়েছে কাঁটার মুকুট
তুলে দিতে হয় আমাকেই
আমার দু'হাত ভর্তি অঢেল দয়া, আমাকে কেউ
ফিরিয়ে দিয়েছে বলে গোটা বিশ্বপ্রকৃতিকে
মনে হয় খুব আপন
আমার অহংকার পাহাড় শিখর ছাড়িয়ে ফের বিনীত
হয়ে আসে
আমি দুনিয়াকে সুখী হবার আশীর্বাদ করি।

নীরা, তুমি…

নীরা, তুমি নিরন্নকে মুষ্টিভিক্ষা দিলে এইমাত্র
আমাকে দেবে না ?
শ্মশানে ঘুমিয়ে থাকি, ছাই-ভস্ম খাই, গায়ে মাখি
নদী-সহবাসে কাটে দিন
এই নদী গৌতম বুদ্ধকে দেখেছিল
পরবর্তী বারুদের আস্তরণও গায়ে মেখেছিল
এই নদী তুমি।

বড় দেরি হয়ে গেল, আকাশ পোশাক হতে বেশি বাকি নেই
শতাব্দীর বাঁশবনে সাংঘাতিক ফুটেছে মুকুল
শোনোনি কি ঘোর দ্রিমি দ্রিমি ?

জলের ভিতর থেকে সমুত্থিত জল কথা বলে
মরুভূমি মেরুভূমি পরস্পর ইশারায় ডাকে
শোনো, বুকের অলিন্দে গিয়ে শোনো
হে নিবিড় মায়াবিনী, ঝলমলে আঙুল তুলে দাও
কাব্যে নয়, নদীর শরীরে নয়, নীরা
চশমা-খোলা মুখখানি বৃষ্টিজলে ধুয়ে
কাছাকাছি আনো
নীরা, তুমি নীরা হয়ে এসো।

কে ?

বাগানে কার পায়ের ছাপ ? ফুল-ঘাতক
কে ?
নদীর ধারে পথ হারানো একলা-মুখো
কে ?
দৌড়ে হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে গেল
কে ?
বাঁ হাত ভরা প্রতিশ্রুতি, ডান হাতে ভয়
কে ?
রিক্সাওয়ালার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে নাচে
কে ?
ফিরে আসবো বলেও আর ফিরে এলো না
কে ?
সারাবছর স্বপ্ন দ্যাখে ছুটি চুরির
কে ?
তোমার মিথ্যে আমার মিথ্যে বদলে নেয়
কে ?
লালকে হলুদ হলুদকে লাল রঙ ফেরায়
কে ?
আগুন কিংবা প্রেমের মধ্যে জল মেশায়
কে ?
দুঃখ আর অতৃপ্তির তৃতীয় ভাই
কে ?

মুহূর্তের অস্থিরতা

বারুদ রঙের এক বাড়ি, তার বারান্দায়
শীতের রোদ্দুরে
আমারই মনুষ্যদেহ।

বাগানে অনেক ডালপালা, তার এক ডালে
কুসুম ফোটেনি
সেখানে আমার আত্মা।

কখনো আমার হিম আত্মা এই নরদেহ
চেয়ে চেয়ে দেখে
দেখার মতন দেখা।
কখনো লৌকিক চোখ সুড়ঙ্গ দেখার
মতো সরু চোখে
আত্মার দর্শন চায়।

কিছুই মেলে না
মুহূর্তের অস্থিরতা ঘূর্ণী বাতাসের মতো উড়ে গেলে
আয়নায় রক্তের ছাপ পড়ে
আমারই থুতনির রক্ত—

মাত্র এই এক জীবনে

অনেক গোপন কথা আছে
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা
নদীর এক ধারে শুধু সারিবদ্ধ গাছ রুদ্ধবাক
আমাদের দিনগুলি জলের ভেতরে জল
তারও নিচে জল
রোদ্দুরের পাশাপাশি ছায়ার নির্মাণ, তারা ক্রমশই গাঢ়
অনেক গোপন কথা আছে
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা
যে-কথা তোমার নয়, যে-কথা আমার নয়

সকলেই সেই কথা বলে
কেউ চলে যায় দূরে একা মুখ লুকোবার ছলে
পিঁপড়ের সংসার ভেঙে যায়
পড়ে থাকে ঝুরো ঝুরো মাটি
ভালোবাসা ছিল, যেন লম্বা এক গলা তোলা প্রাণী
দিন চলে যায় রাতে, রাত্রিগুলি শুধুই অদৃশ্য
নীরব মুহূর্তে গাঁথা মালাখানি আমাকেও রেখে যেতে হবে
অনেক গোপন কথা…
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা !

একটি প্রার্থনা-সংগীত

গরুদের জন্য দাও ঘাস জমি, খোলামেলা ঘাস জমি,
চিকন সবুজ
ওরা তো চেনে না কোনো রান্নাঘর, ওরা বড় ন্যালাখ্যাপা
অবোধ অবুঝ
কুকুরের জন্য দাও কাঁচা মাংস, লাল মাংস, রক্তমাখা হাড়
ওরা তো খায় না ঘাস, সবুজকে ঘেন্না করে, ওরা চায়
হাড়ের পাহাড়
বাঘেরা বেচারি বড়, দিন দিন কমে যায়, চিড়িয়াখানায় শুধু
বাঘ দেখা হবে ?

ওদেরও জন্য দাও নধর হরিণ, দাও খরগোশ
বনের বাঘেরা ফের
মাতুক পুরোনো উৎসবে !
বিড়ালকে মাছ দাও, ব্যাঙেদের সাপ দাও, থুড়ি থুড়ি থুড়ি
সাপদের দাও ব্যাঙ, ছোট-বড় ব্যাঙ
টিকটিকিদের দাও প্রজাপতি, আর কুমিরকে মাঝে মাঝে
ছুঁড়ে দিয়ো
দু-একটা ছাগলের ঠ্যাং !

নদীদের মেঘ দাও, পাহাড়কে দিয়ো গাছ, আর গাছেদের
দিয়ো ঠিকঠাক ফুল ফল

পেঁপে গাছে কোনোদিন ফলে না কখনো যেন হঠাৎ কাঁঠাল
আর নারকোলে ভুল করে
কোকোকোলা দিয়োনাকো
দিয়ো শাঁস জল !

আর মানুষের জন্য দাও…
আর মানুষের জন্য দাও…
কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, হা-হা-হা-হা
কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, হা-হা-হা-হা
কিচ্ছু না, কিচ্ছু না
কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। …

মধ্যরাত্রির নিরালায়

মধ্যরাত্রির নিরালায় সন্ন্যাসী তাঁর মুখোশটি খুলে
দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলেন
তারপর শুতে গেলেন পাথুরে মেঝেতে
তাঁর বিনা সাধনায় ঘুম এলো
ক্রমশ তাঁর ওষ্ঠে ফুটে ওঠে ম্লান, ছাইমাখা হাসি
হাত দুটি বুকের ওপরে আড়াআড়ি রাখা
এখন তিনি ঈশ্বরহীন প্রকৃত নিঃসঙ্গ।

আকাশ-ছড়ানো স্তব্ধতা খানখান করে চিরে
অকস্মাৎ ধমকে উঠলো চন্দ্রমৌলি পাহাড়-শিখরের বজ্র
পাইন বনের কোনাচে গড়ন ঝলসে উঠলো
কোনো এক অজানা শিসের তীক্ষ্ণ শব্দে
সন্ন্যাসী পাশ ফিরলেন, মুখে তাঁর
শিশুকালের লালা
একটি কালো রঙের বেড়াল থাবা ঘুরিয়ে মারলো
জ্যোৎস্নার ছায়াকে
ধুনির নিভন্ত আগুনে কোনো কাঠুরের দীর্ঘশ্বাস
নারীর গোপন দুঃখের মতন অন্ধকার-ঢাকা নদী,

তার কিনারে পায়ের ছাপ
ঘুমন্ত সন্ন্যাসীর পবিত্র অন্তঃকরণ থেকে
জেগে উঠলো হাহাকার,
আমি ! আমি !
তাঁর শরীরে ছিঁড়ে যেতে চাইলো চার খণ্ডে
হাত তুলে তিনি ব্যাকুলভাবে আলিঙ্গন করলেন
শূন্যতা
তৃতীয় প্রহরের নিয়মিত দুঃস্বপ্নে তাঁকে
পাহারা দিতে লাগলো
তাঁর কঠিন, জাগ্রত পুরুষাঙ্গ ।—

জনমদুখিনী

যতদিন ছিলে তুমি পরাধীনা ততদিন ছিলে তুমি সবার জননী
এখন তোমাকে আর মা বলে ডাকে না কেউ
লেখে না তোমার নামে কবিতা
বুক মোচড়ানো সুরে সেইসব গান
গুপ্ত কুঠুরিতে মৃদু মোমের আলোর সামনে আবেগের মাতামাতি
জনমদুখিনী মা কোনোদিন স্বাধীনা হলে না
এখন তোমাকে আর ভুলেও ডাকে না কেউ
আঁকে না তোমার কোনো ছবি
কেউ কারো ভাই নয়, রক্তের আত্মীয় নয়
নদীর এপার দিয়ে, নদীর ওপার দিয়ে চলে যায় বিষণ্ণ মানুষ !

সমূহ অতল

কে অমন নেমে গেল এইমাত্র সিঁড়ি দিয়ে ছুটে
দরজা খোলা, সমস্ত আসবাবে হাহাকার
জানালা আছড়ে দিল রঙিন বাতাস ।

কলের জলের স্রোত অকস্মাৎ গেল অস্তাচলে
শূন্য ছাইদান থেকে উঠে আসে ধোঁয়া

কে কোথায় হেসে উঠলো কথা ঘোরাবার লঘু ছলে ?

দেয়াল ঘড়িটি বন্ধ, পাশে ডেকে উঠলো টিকটিকি
জানালা আছড়ে দিল রঙিন বাতাস
এক দিকে পাশ ফেরা ছবির রমণী দোলে, উরু দোল খায়।

আলো ছিঁড়ে যায় মেঘে, ক্রমশই আরোপিত মেঘ
মানুষের একাকিত্ব ছুঁয়ে দেয় সশব্দ প্রকৃতি
আমিও মানুষ, নাকি অবয়ব, ছিঁড়েছে শিকড় ?

এখানে ছিল না কেউ, এখানে আমিও নই একা
কে অমন নেমে গেল দপ্‌দপিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে
এমনও তো সিঁড়ি আছে, যার নিচে সমূহ অতল।

কাব্যজিজ্ঞাসা

মায়ের কপট ঘুম, বাপ বাইরে,
তিনটি শিশু কাঁদে অহরহ
ক্ষুধার্ত মানুষ আনে কাব্যে কোন্ রস, তা কি জানেন ভামহ ?
নদীটির মৃতদেহ আগলে আছে
গ্রামখানি, নির্মেঘ দুপুর
এই দৃশ্যে লাগে কোন্ অলংকার, তা কি লিখেছেন কর্ণপুর ?

চেনা হলো না

অন্তত সাড়ে-তিন হাজার উপমা দিয়েছি
তবুও চেনা হলো না
না তোমাকে, না তোমাকে, না তোমাকে।

ধর্ম কিংবা ঈশ্বর চিন্তায় মন দিইনি কখনো
তাতে বাঁচিয়েছি অনেকটা সময়
সেই সময় নিয়ে মাথা খুঁড়েছি ছন্দ মিলে

শব্দের প্রতিবেশী শব্দ
ধ্বনির পাশাপাশি ধ্বনি
সব-কিছুর ওপর ঝড়ে নির্লিপ্ত ঘুম
তবু চেনা হলো না
না তোমাকে, না তোমাকে, না তোমাকে।

সমুদ্রের ধারে শিহরন জাগানো নিরালা বাংলো
চাঁদ ও অন্ধকারের দায়িত্ব ছিল
সেখানে সব-কিছু সুসজ্জিত রাখার
ভিজে বালির রেখা ধরে হাঁটতে হাঁটতে
একদিন দেখা হলো
জেলেপাড়ার মহারানীর সঙ্গে
চম্‌কে উঠেছিলুম, এ কী সেই
যার জন্য আমার নিজস্ব দ্বীপে
বাতাবরণ সৃষ্টি করার কথা ?
চোখের নিমেষে সে কাদাখোঁচা হয়ে উড়ে গেল।
তখন আমি নিয়ে বসলুম
খাতা ও কলম
তবুও চেনা হলো না
না তোমাকে, না তোমাকে, না তোমাকে।

হাসপাতালে নার্সের কপালে গোল আয়না
যেন প্রথম দিনের সূর্য
আবার উপমা ? না. আয়না শুধু আয়না
কিন্তু তাকেও প্রশ্ন করা যায়,
আর কি ফিরে আসবো, আবার দেখা হবে ?
জ্ঞান হবার পর ফিরে এলো অন্য একজন মানুষ
আয়নায় অন্য মুখ
চেনা হলো না, চেনা হলো না
না তোমাকে, না তোমাকে, না তোমাকে।

নীল হাত

অর্জুন গাছের সঙ্গে বাঁধা ছোট ডাক-বাক্সটিকে
এইমাত্র ছুঁয়ে গেল একটি নীল হাত
মেখলিগঞ্জের রাস্তা শুয়ে আছে
এপাশে ওপাশে শুনশান।

বড় বড় গাছগুলি রোগা হয়ে গেছে এই শীতে
গোলাপ বাগানে ওরা স্বাস্থ্যবতী,
যে-রকম সবজিরা যুবতী
ভোরের পাতলা হাওয়া দোল খায় দোপাটির ঝাড়ে
সবই অবিচ্ছিন্ন ঠিকঠাক
তবু সাতটার বাসে জানলা থেকে
এক ঝলক একটি নীল হাত
আমায় হাতছানি দিয়ে গেল!

নীল, নীল, শুদ্ধ নীল, সমুদ্রে চাঁদের মতো নীল
অলীক বিদ্যুৎ লেখা যেন খুব কাছে
কখনো দেখিনি স্বপ্নে, চোখের পলকমাত্র দেখা
কৈশোর যৌবন ঘিরে স্পষ্ট তিনবার
যেদিন একুশে পা, মনে আছে
শেষবার সেই হাত প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল।

নীল হাত, নীল হাত, আমার এমন জ্বরে গরম নিশ্বাসে
দুপুরের নিরালায়, শরীরের বিষে
একাকিত্ব যাতনায়, মানুষের মুখ ভুলে যাওয়ায় বাসনায়
একবার চোখে চেপে ধরো।

ভোরবেলার মুখচ্ছবি

ভোরবেলার মুখচ্ছবি কোথায় লুকিয়ে রাখো
সারাদিন ?

দিনগুলি রেফ্ ও র-ফলা দিয়ে লেখা
স্নেহ গলে যায় রোদে, রোমকূপে বেড়ে ওঠে ঝাঁঝ
হাসি হাসি মুখগুলি এ ওর দু'কানে ঢালে বিষ
পাখি নেই, খাঁচাগুলি নড়ে চড়ে অযথা দৌড়োয়
জুতোর তলার ধুলো ধুলো নয় প্রচ্ছন্ন বারুদ
তোমায় দেখি না কেন, দেখেও চিনি না…

ভোরবেলার মুখচ্ছবি কোথায় লুকিয়ে রাখো
সারাদিন ?

খিদে-তেষ্টা

সজোরে খিদে পেয়েছিল,
তাই গিয়েছি খিড়কির দরজায়
এরকম ছোট ভুল হয়
নিজের হাত-পা তো কামড়ে কামড়ে খাইনি
দাঁত বসাইনি কোনো
চকিতা হরিণীর ঘাড়ে
শুধু ভিক্ষে চেয়েছিলুম তার কাছে।
ঘুমের মধ্যে সারা শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে
ভেঙে যায় ভুল
তবু আবার তো ঘুমোতেই হয় মানুষকে
পরবর্তী ভুলটির জন্য।

তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছিল
কিন্তু এমন কিছু না
মরীচিকা ভেবে তো ছুটে যাইনি
কারুর কেয়ারি করা বাগানে
চাল-আড়তের কুলির

বুকের ঘাম চাটিনি
জিভ বাড়াইনি সম্রাটের
এঁটো থুতুর দিকে
তবু তো তৃষ্ণা মরে না।
বাতাসে নেই বৃষ্টি
শুকনো ঝর্নার ধারে পড়ে আছে
একরাশ মৃত প্রজাপতি
চোখে পড়ে না কোনো স্নিগ্ধ
অমৃত সরোবর।
আমার অস্থিরতা অজগরের মতন ফোঁসে
কারুকে কাঁদাবার জন্য
তার অশ্রু পান করবার জন্য।

বিরহিণীর শেষ রাত্রি

নতুন জানলার পাশে দাড়ি-না-কামানো থুতনি
রাত-জাগা চোখ।
কিছু দূরে টিলা
ডালপালা ছুঁয়ে আছে পীতবর্ণ মেঘ
তার ওপাশ অসীমের ঘর-বাড়ি।
বাতাসে ছড়িয়ে আছে তারা-পোড়া ছাই
বস্তুত এখন এই শেষ রাতে পৃথিবীরও
হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে উঠবার
দাবি আছে।
এই নারী…
সেও কি পুরুষ চায়…
ছায়াপথ জুড়ে তার রতিতৃষ্ণা
উরু খুলে ডাকে কোনো চণ্ডাল-গ্রহকে?

হঠাৎ আকাশ খুলে যায়
যেন কোনো জাদুকর আমার মোহকে
জব্দ করবার জলে ছড়িয়েছে নতুন সম্মোহ
লক্ষ লক্ষ ডানাওয়ালা শিশু

হুবহু প্রি-র‍্যাফেলাইট
দ্বাদশ সূর্যকে ঘিরে খলখল শব্দে
হাসে।
এরা সব কোথা থেকে এলো ?
আমি তন্নতন্ন করে খুঁজি
ফের সিগারেট জ্বেলে
দেখি এই নতুন আকাশ।

পূর্বসংস্কার বশে আমার মগজ চায়
হাওয়ার তরঙ্গে ভাসা
দিক্‌বসনা রুবেন্‌স রমণী।
নেই।
শুধু শিশুদের ওড়াউড়ি…
ক্রমে ক্রমে তারা সব রং হয়ে গলে পড়ে
যেরকম রং
ছোঁয়নি কখনো কোনো পার্থিব আঙুল।
নীলের হৃদয়-চেরা নীল
টারকোয়াজ মথিত চাপা আভা
মার্জারি চক্ষুর মতো বিচ্ছুরিত হলুদ-খয়েরি
পাথরের ঘুম-ভাঙা সহসা-রক্তিম…
সেইসব রং ঠিক
জলস্তম্ভ হয়ে ওঠে
ফের ভাঙে
পরস্পর ঝাপ্‌টা মারে, যেন
শত শত ঐরাবত
স্নানের নেশায় মেতে আছে।

এমন নয় যে আমি এতেই মুগ্ধ হবো
স্তব্ধবাক হয়ে যাবো।
দৃশ্য-দৃশ্যান্তর ভেদ করে
উঠে আসে কান্না
এই দুঃখী বিরহিণী পৃথিবীর কান্নার আওয়াজ
কিছুতে ঢাকে না।
জেগে ওঠে গাছপালা

নদী ও নগরী
সুন্দরের একান্ত নিজস্ব নশ্বরতা।
মানুষ চায় না আর
মানুষের আয়ু
শিশুর খেলনার মতো চুতর্দিকে ধ্বংসবীজ
যে-কোনো রাত্রিই যেন
শেষ রাত
যে-কোনো শব্দই যেন শেষ ধ্বনি
যে-কোনো আলোই যেন
শেষ অন্ধকার আমন্ত্রণ।
যদি তাই হয়, তবে
তার আগে
রজস্বলা, হে ধরিত্রী,
অন্তত একবার
মহান সঙ্গমে যাও মহাশূন্যে
জ্বলে ওঠো
নিজের আগুনে।

একটা দুটো ইচ্ছে

একটা দুটো ইচ্ছে আমায় ছুটি দিচ্ছে না
যাবার কথা ছিল আমার সাড়ে ন'টার ট্রেনে
ছিল অটুট বন্দোবস্ত, রাত-পোশাকের বোতাম
তিনটে বাতিঘর পেরুলেই সীমা-সুখের স্বর্গ
একটা দুটো ইচ্ছে আমায় ছুটি দিচ্ছে না।

খেলাচ্ছলে দেখা হলো, খেলা ভাঙলো রাতে
শরীরময় জড়িয়ে রইলো সুদূরপন্থী হাওয়া
নদীর মতো নারীর ঘ্রাণ মোহ মধুর স্মৃতি
সবই বুকের কাছাকাছি, যেমন কাছে আকাশ
একটা দুটো ইচ্ছে তবু ছুটি দিচ্ছে না।

কাব্য পরিচয়

দাঁড়াও সুন্দর

বৈশাখ ১৩৮২ সালে বিশ্ববাণী প্রকাশনী (৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯) থেকে প্রকাশ করেন ব্রজকিশোর মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা ৪৭, পৃষ্ঠা ৬৪, দাম ৫ টাকা, বোর্ড বাঁধাই। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। উৎসর্গ 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু'। পরে (শ্রাবণ ১৩৮৭) বইটির ৪৩টি কবিতা বিশ্ববাণী প্রকাশনীর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) সংকলনে প্রকাশিত হয়।

মন ভালো নেই

আষাঢ় ১৩৮৩ সালে বিশ্ববাণী প্রকাশনী (৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯) থেকে প্রকাশ করেন ব্রজকিশোর মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা ৪৯, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪, বোর্ড বাঁধাই, দাম ৫ টাকা। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। উৎসর্গ 'প্রতিমা ও শঙ্খ ঘোষকে'। পরে (শ্রাবণ ১৩৮৭) সম্পূর্ণ বইটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) সংকলনে অন্তর্ভূত হয়।

এসেছি দৈব পিকনিকে

শ্রাবণ ১৩৮৪ সালে বিশ্ববাণী প্রকাশনী (৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯) থেকে প্রকাশ করেন ব্রজকিশোর মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা ৪৩, কাব্যনাটক ১টি, পৃষ্ঠা ৬৮, বোর্ড বাঁধাই, দাম ৫ টাকা। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল 'মীনাক্ষী ও জ্যোতির্ময় দত্তকে'। বইটি পরে (শ্রাবণ ১৩৮৭) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) সংকলনে প্রকাশিত হয়।

দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায়

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ সালে বিশ্ববাণী প্রকাশনী (৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯) থেকে প্রকাশ করেন ব্রজকিশোর মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা ৪৪, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪, বোর্ড বাঁধাই, দাম ৫ টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। বইটি উৎসর্গ করা হয় 'ট্র্যাডবার্টা ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে'। পরে (শ্রাবণ ১৩৮৭) সম্পূর্ণ বইটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) সংকলনে প্রকাশিত হয়।

স্বর্গ নগরীর চাবি

শ্রাবণ ১৩৮৭ সালে বিশ্ববাণী প্রকাশনী (৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯) থেকে প্রকাশ করেন ব্রজকিশোর মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা ৩৭,

পৃষ্ঠা ৬৪, বোর্ড বাঁধাই, দাম ৬ টাকা। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। বইটি উৎসর্গ করা হয় 'মেরিয়ান ও প্রণবেন্দু দাশগুপ্তকে'।

সোনার মুকুট থেকে

চৈত্র ১৩৮৮ সালে নাভানা (পি ১০৩, প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলকাতা-৭২) থেকে প্রকাশ করেন কুণালকুমার রায়। কবিতার সংখ্যা ৩৪, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৬, বোর্ড বাঁধাই, দাম ৮ টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। 'ডক্টর জয়ন্ত সেন-কে' বইটি উৎসর্গ করা হয়।

কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

(প্রথম পঙ্‌ক্তি, কবিতার নাম, পৃষ্ঠা)

অঙ্গুলিমাল, তুমি স্থির হও (বুদ্ধের স্মৃতিতে) ১৯৬
অর্জুন গাছের সঙ্গে বাঁধা ছোট ডাক-বাক্সটিকে (নীল হাত) ২৩৬
অনেক গোপন কথা আছে (মাত্র এই এক জীবনে) ২৩০
অনেক উৎসবে ছিল আমাদের (উৎসব শেষে) ৪৪
অন্তত সাড়ে-তিন হাজার উপমা দিয়েছি (চেনা হলো না) ২৩৪
অন্ধকার প্রান্তরের মধ্যে শুধু একটি (দূরের বাড়ি) ৫১
'অরুণোদয়ে'র মতো শব্দ আমি বহুদিন (নাম নেই) ৪০
অসমাপ্ত কবিতার ওপরে ছড়িয়ে আছে ঘুম (অসমাপ্ত কবিতার ওপরে) ২১৩
অস্ত্র বানিয়েছিলুম পশুর বিরুদ্ধে, আজ পশুরা নিঃশেষিতপ্রায় (আত্মদর্শন) ১১৫

আপাতত বিশ্বশান্তি, এক ঘণ্টা চব্বিশ মিনিট (মনে পড়ে না ?) ২২০
আমাকে দিও না শান্তি, শিয়রের কাছে কেন এত নীল জল (সারাটা জীবন) ১৬২
আমাকে চিনতেন তিনি, দেখা হতে বললেন, কে তুমি (আত্মপরিচয়) ২২৪
আমরা জানি না (আগামী পৃথিবীর জন্য) ১৯৯
আমার খুব কুচবিহার যেতে ইচ্ছে হয় (ভ্রমণ কাহিনী) ৫০
আমার মন খারাপ, তাই যাই জলের কিনার (জলের কিনারে) ৫৮
আমার যমজ ভাই দুঃখ, আজ বহুদিন পলাতক (ভাই ও বন্ধু) ৭৬
আমার প্রকৃতি প্রেম খুব-একটা ছিল না কৈশোরে (ছিল না কৈশোর) ১৪৮
আমার নরক সত্যিই ভালো লাগে না। আমি স্বর্গে ফিরে আসতে চাই (বিক্ষিপ্ত চিন্তা) ২০৩
আমার চুলে এখনো মাখা লাল রঙের ধুলো (সেই সন্ধ্যা ও রাত্রি) ২০৪
আমাদের চমৎকার চমৎকার দুঃখ আছে (এ রকম ভাবেই) ১৫৬
আমি মরে যাবো, তাই পৃথিবী দুঃখিনী (পৃথিবী ও আমি) ২৩
আমি তো মৃত্যুর কাছে যাইনি, একবারও (দেখি মৃত্যু) ৩৯
আমি ভুল সময়ে জন্মেছি তাই আমায় কেউ চিনতে পারে না (ভুল সময়ে) ৪০
আমি তো দাঁড়িয়ে ছিলাম পাশে, সামনে বিপুল জনস্রোত (স্বপ্নের কবিতা) ৮৩
আমিও শিখেছি তার একইসঙ্গে পবিত্র ও লোভনীয় ওই (লেখা শেষ হয়নি, লেখা হবে) ১৬৯
আসলে একটিও নারী নেই, সবই নারীর আদল (আসলে একটিও) ১৮৭

ইচ্ছে তো হয় সারাটা জীবন (মানস ভ্রমণ) ১৯৭

ঈষৎ ধারালো রোদে কুমীরের ডিম খোঁজে (অন্য ভ্রমণ) ৬১

এ পৃথিবী চেয়েছে চোখের জল, পায়নিও কম (রেলের কামরায় পিঁপড়ে) ৯৮
এ কার উদ্যান ? কে এত সযত্নে সাজিয়েছে (এ কার উদ্যান) ১০০
এই মুহূর্তে যে কাঁদলো তাকে ঘেন্না থেকে মুক্তি দেবার (সমস্ত পৃথিবীময়) ৬৯
এই দুরন্ত রাতের খেলা, কথা ছিল (কথা ছিল) ১০৮

এই অন্ধকার পথ চলে গেছে সমুদ্র কিনারে (জলের কিনারে) ১১২
এই পৃথিবীর সঙ্গে একটা আলাদা পৃথিবী মিশে রয়েছে (দীর্ঘ কবিতাটির খসড়া) ১৪২
এই যে বাইরে হুহু করা ঝড়, এর চেয়ে বেশি (চোখ নিয়ে চলে গেছে) ১৬৫
এই নিস্তব্ধতা বড় তীক্ষ্ণ, যে শব্দভেদী, যে প্রেমহীন (কল্যাণেশ্বরী বাংলোয়) ২১৯
এই সাবলীলতার কাছে তুমি হাঁটু মুড়ে বসো (একমাত্র সাবলীল) ২২৫
এই সুখ কে এনেছে (ডাক শোনা যাবে) ২২৫
এইটুকুনি শহর তার দু'দিকে ট্রেন লাইন (চায়ের দোকানে) ৯৬
এক সময় দুঃখের কথা দুঃখের সুরে বলতাম (দুঃখ) ১৪৫
এক এক সময় মনে হয়, বেঁচে থেকে আর লোভ নেই (নিজের কানে কানে) ১৪৪
একজন ডাক্তারের চেম্বারে। সাহেব পাড়ায়। সন্ধের পর এ অঞ্চল নিঝুম (প্রাণের প্রহরী) ১১৮
একটা ভীষণ গোপন কথা (আমার গোপন) ৮৫
একটা দুটো ইচ্ছে আমার ছুটি দিচ্ছে না (একটা দুটো ইচ্ছে) ২৪০
একটাই তো কবিতা (একটাই তো কবিতা) ১৭৪
একটামাত্র জীবন তার হাজার রকম দুনিয়াদারি (একটা মাত্র জীবন) ১৪৯
একটি কথা বাকি রইলো থেকেই যাবে (একটি কথা) ১৬
একটি বিমূর্ত মূর্তি, পাথরের, সুবৃহৎ চৌকো চোখ (শিল্প প্রদর্শনীতে) ৯৪
একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল আর এক নৈঃশব্দ্যকে ছুঁতে (একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল) ১১৩
একটু আধটু বিপদ ছিল পথের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো (যাত্রাপথ) ১৪৭
একটুখানি মৃত্যু দেবে (যা চেয়েছি) ১৫০
একটুখানি ভুল পথ, অনায়াসে ফিরে যাওয়া যেত (সোনার মুকুট থেকে) ২১৩
এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন (এখানে কেউ নেই) ১১২
এমন রোদে বেড়িয়ে এলো শরীর (শরীর) ৩৭
এমন মানুষ রোজই দেখি, যাঁরা আমায় আগে চিনতেন (জেনে গেছি) ৮৩
এমনভাবে হারিয়ে যাওয়া সহজ নাকি (ইচ্ছে হয়) ১৪৬
এসেছে হাজার হাজার মানুষ, এসেছে, দেখেছে (চাসনালা) ৭৫
এসো, আলাদা মানুষ হয়ে যাই (আলাদা মানুষ) ২০৫

ও চুলে তোমার বেণীবন্ধন কিছুতেই মানাবে না (শরীরের ছায়া) ৬৭
ওরা যারা যখন তখন মরে (নির্বোধ) ৫৬

কত দূরে বেড়াতে গেলুম, আর একটু দূরেই ছিল স্বর্গ (স্বর্গের কাছে) ৩৫
কবিতা আমার ওষ্ঠ কামড়ে আদর করে (প্রেমিকা) ৩৪
কবিতা লেখার চেয়ে কবিতা লিখবো এই ভাবনা (কবিতা লেখার চেয়ে) ১৪০
কবিতার সার কথা সত্য, অথচ কবিরা সব (মিথ্যে নয়) ২২২
কাঠগুদামের পাশে একটুকরো প'ড়ো জমি (কবির মিনতি) ১৫০
কালো অক্ষরে থেকেছি মগ্ন সারাদিন সারা মাস ও (কালো অক্ষরে) ১০০
কী ঘর বানাইছে দ্যাখো সাহেব কোম্পানি (দেহতত্ত্ব) ৫২
কে তুমি ? আড়াল থেকে সামনে এসো (কে তুমি) ১০২
কে যে মনীশকে ডাকলো, মনীশের জাগরণ ভেঙে (অ) ২১৮
কে অমন নেমে গেল এইমাত্র সিঁড়ি দিয়ে ছুটে (সমূহ অতল) ২৩৩
কেউ কাছে নেই, ছায়া গেছে দূর বনে (ছায়ার জন্য) ৫৭
কেউ জানে না, গোপনে গোপনে জল বেড়ে উঠছে (জল বাড়ছে) ৮৬
কেউ কেউ আলো চায় না, চিরদিন এই পৃথিবীকে (চরিত্র বিচার) ৩০
কেউ কেউ ভালোবাসে ভুল করে, কেউ কেউ ভালোই বাসে না (কই, কেউ তো ছিল না) ২০২
কোকিল কি ডেকে উঠেছিল (নবান্নতে ফিরে গেছে কাক) ৪৯

কোথায় তোমার রূপ, গ্রীবায় না চক্ষের মণিতে (চরিত্রের অভিধান) ৫৯
কোন দিকে যাবো (দুই বন্ধু) ২৭

খড়ের চালায় লাউডগা, ওতে কার প্রিয় সাধ লেগে আছে (নেই) ১৪৭

গরীব না খেয়ে থাকে, গরীব রাস্তায় শুয়ে থাকে (তুমি আমি) ১১৭
গরুদের জন্য দাও ঘাস জমি, খোলামেলা ঘাস জমি (একটি প্রার্থনা সংগীত) ২৩১
গাছ তার ঝরে পড়া ফুলগুলি নিয়ে কিছু ভাবে (ফুল) ৯৬
গোলাপে রয়েছে আঁচ, পতঙ্গের ডানা পুড়ে যায় (প্রতীক্ষায়) ৭৯

ঘুমন্ত নারীকে জাগাবার আগে আমি তাকে দেখি (নারী ও শিল্প) ৩৩

'চক্ষুলজ্জা' শব্দটি লিখে, একটু ভেবে, আবার কেটে দিই (প্রথম লাইন) ১৮৬
চিত্ত উতলা দশদিকে মেলা সহস্র চোখ (তমসার তীরে নগ্ন শরীরে) ৮১
চিড়িয়া মোড়ে নেমে পড়লো দূরদেশিনী (মুখ দেখিনি) ১১২
চোখে চোখে লেগে থাকে (দুঃখ ও জানে না) ৭০

ছিল আমার শূন্য খাঁচা, উড়তে উড়তে এলো একটা (হলুদ পাখিরা) ৮৪
ছিলাম ঘুমন্ত, কে যেন আমায় নাম ধরে স্পষ্ট ভাবে ডাকলো (নিশির ডাক) ২৫
ছিলে কৈশোর যৌবনের সঙ্গী, কত সকাল, কত মধ্যরাত (কৃত্তিবাস) ১৫৭
ছেঁড়া জামা, রুক্ষ চুল, জুতোয় পেরেক (দেখিনি বহু দিন) ১০২

জাদুদণ্ড তুলে বললে, এখন বিদায় (তোমাকে ছাড়িয়ে) ৩২
জুলপি দুটো দেখতে দেখতে সাদা হয়ে গেল (কিছু পাগলামি) ১৬৬

ঝর্নায় ডুব দিয়ে দেখি নিচে একটা তলোয়ার (ঝর্নার পাশে) ৫৪
ঝড়ের ঝাপটায় উল্টে গেল একটি ঘুঘু পাখি (ঝড়) ২০৮

টিলার মতন উঁচু বাড়ির শিখরতলায় (কথা ছিল না) ১৪১

ডোরাকাটা সোয়েটারের মতো চামড়া (খেয়াঘাটে) ৯১

তখন তোমার বয়স আশী, দাঁড়াবে গিয়ে আয়নায় (এখনো সময় আছে) ৭২
তাঁতীপাড়ায় পেছন দিকে নাবাল জমি (একটি ঐতিহাসিক চিত্র) ১৭৫
তিনজন অমলকে চিনি তারা কেউ ডাকঘরের নয় (সুধা, মনে আছে ?) ৯৯
তুমি জেনেছিলে মানুষ মানুষ (তুমি জেনেছিলে) ৭৯
তুমি কি বিশ্বাস ভুলবে, বলবে এসে, প্রথম তরুণ (অবেলায় প্রেম) ১১৬
তুমি তো আনন্দে আছো, তোমার আনন্দ (অভিশাপ) ১৯০
তোমার গলার মুক্তোমালা ছিঁড়ে পড়লো হঠাৎ (মুক্তো) ৩৫
তোমার পাশে, এবং তোমার ছায়ার পাশে (ঘুরে বেড়াই) ৭০
তোমার মুখের পাশ কাটা ঝোপ, একটু সরে এসো (অপরাহ্ণে) ২২৩

দরজা খুলেছো তুমি, সময় খোলেনি (সময় খোলেনি) ৩৪
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তোমার হঠাৎ চুমুতে (দরজার পাশে) ১৬৩
দারুণ সুন্দর কিছু দেখলে আমার একটু একটু (এখন) ১৫৯
দিনের মানুষ সবাই হলুদ, রাতের মানুষ নীল (দিন-রাতের মানুষ) ১৮৮

দুই হাতে মৃত্যু নিয়ে ছেলেখেলা করার বিলাস (একবারই জীবনে) ৩১
দুঃখ এসে আমায় ধরলো উপত্যকার পাশে (উপত্যকার পাশে) ২৯
দুঃখ চেয়েছি, তা বলে এতটা দুঃখিত হয়ে (এই সময়) ১০৭
দেখ অন্ধকারে শুয়ে কী বিশাল দিগন্ত মরাল (দীর্ঘ অন্ধকার) ২০৩
দেখা হবে চৌরাস্তায় বুধবার বিকেল পাঁচটায় (দেখা হবে) ১১৬
দেবে না চুম্বন ঐ ঠোঁটে (প্রত্যাখ্যান) ১১০

ধলভূমগড়ে আবার ফিরে গেলাম, যেন এক সৃষ্টিছাড়া (ধলভূমগড়ে আবার) ১০৬

নতুন জানলার পাশে দাড়ি-না-কামানো থুতনি (বিরহিণীর শেষ রাত্রি) ২৩৮
নদীর সঙ্গে খেলা শুরু করবার মুহূর্তে (পুনর্জন্মের সময়) ১৬১
নদীটির স্বাস্থ্য ছিল ভালো, এবং সন্ধ্যার আগে (নদীর পাশে আমি) ১৩
নদীপ্রান্তে বসে আছে এক উন্মাদ, আমি প্রথমে তাকে কবি ভেবেছিলাম (নদীর ধারে) ১৫১
নাস্তিকেরা তোমায় মানে না, নারী (নারী) ১৭
নীরা, তুমি নাও দুপুরের পরিচ্ছন্নতা (নীরার জন্য) ১৮৯
নীরা, তুমি নিরন্নকে মুষ্টিভিক্ষা দিলে এইমাত্র (নীরা, তুমি···) ২২৮

পথে পথে পড়ে আছে এত কৃষ্ণচূড়া ফুল (আমি নয়) ২১
পথের রাজাকে আমি দেখেছি গভীর রাত্রে (পথের রাজা) ৬৯
পবিত্রতা, বেড়াতে গিয়েছো তুমি (ফিরে এসো) ১৮৬
পরিত্যক্ত মন্দিরের ভাঙা সিঁড়িতে বসে (অনেক দূরে) ২৪
পঁচিশ বছর আগে কোনো এক কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচের (দূর যাত্রার মাঝপথে) ১৯২
পাতা পোড়া গন্ধ পায় না পাতা-পোড়ানীরা (নিসর্গ) ২১৫
পাহাড় শিখর ছেড়ে মেঘ ঝুঁকে আছে খুব কাছে (অন্যরকম) ২২
পাহাড় চুড়োয় গড়িয়ে গেল শীতের দুঃখী (ফেরা) ১৯৮
পাহাড়ের সানুদেশে জ্বলছে আগুন (নাচ-খেলা) ১৭৪
পুরনো জন্মের দিকে দৃষ্টিপাতে হয়তো ভয় পাবো (মুক্তি) ২০০
পৌষের পূর্ণিমা রাত ডেকে বললো যা (সে কোথায় যাবে) ৮০
প্রতিটি ব্যর্থ প্রেমই আমাকে নতুন অহঙ্কার দেয় (ব্যর্থ প্রেম) ১৬৪
প্রতীকের মরুভূমি পায় না কখনো মরূদ্যান (প্রতীক জীবন) ২০৬
প্রেসার কুকারে সিটি বেজে উঠলো যেই (শহরের একটি দৃশ্য) ৪১

ফণা তোলা সাপের মতন এমন বিচিত্র সুন্দর আর কি আছে (মায়া সুন্দর) ১০৯
ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি (ফেরা না ফেরা) ১০৭
'ফেরা' এই শব্দটিকে জিভে নিয়ে চোষাচুষি করি (খেলাচ্ছিলে) ১০৮
ফ্রয়েড ও মার্ক্স নামে দুই দাড়িওলা (এই জীবন) ১১৪

বকুলগাছের নীচে অকস্মাৎ নেমেছিল প্রেম (বকুল গাছের নীচে) ৯৪
বন্ধু-সম্মিলন ছিল কাল মধ্যরাতে (বন্ধু-সম্মিলন) ২২১
বহু রকমের চাবি-বন্দী হয়ে আছে এই ঘর (চাবি) ৩৬
বহুক্ষণ মুখোমুখি চুপচাপ, একবার চোখ তুলে সেতু (কথা আছে) ১৪৬
বাইরে খেলায় মেতেছিল যারা (বন্দী) ১৯৮
বাগানে কার পায়ের ছাপ ? ফুল-ঘাতক (কে) ২২৯
বারবার ফিরে আসে, কবিতা, কখনো অসময়ে (বারবার ফিরে আসে) ২০৫
বারুদ রঙের এক বাড়ি, তার বারান্দায় (মুহূর্তে অস্থিরতা) ২৩০
বালির ওপরে কার তাজা রক্ত ? এদিকে ওদিকে (সে কোথায়) ৭৩
বাল্যকালে একটা ছিল বিষম সুখ (স্মৃতি) ২৩

বাসের পাদানি তটে দুটি ইঞ্চি পেয়ে যাই বহু পুণ্যফলে (বাসের ভিতরে) ১১০
বাঁচতে হবে বাঁচার মতন, বাঁচতে বাঁচতে (এই জীবন) ১৪৩
বাঁধের উপর বসে রয়েছে একজন মানুষ (অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত) ১৯২
বিদায়ের পাশ থেকে উঠে যায় দুটিমাত্র স্মৃতি (বিদায় ও বিস্মৃতি) ৬৩
বিপদসীমার ঠিক ধার ঘেঁষে পা ঝুলিয়ে (বিপদসীমার ঠিক ধার ঘেঁষে) ২১৭
বিশ্বাসই হয় না যে এতদিন কেটে গেছে (সেদিন) ১৫২
বৃক্ষের চূড়ায় তিনি পা দিলেন, একজন আগন্তুক (অচেনা দেবতা) ২০৭
বৃষ্টির দিনে আরাম চেয়ারে জানলার পাশে বসবো ভেবেছি (অতৃপ্তি) ৩২

ভাঙা নৌকোয় যাত্রা, তবুও জায়গা আছে (যাত্রা) ৬৭
ভাঙা-বিকেলের শেষে মেলা থেকে যারা ফিরছিল (মেলা থেকে ফেরা পথে) ১৬৮
ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম (ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে) ১৯৩
ভালোবাসা নয় স্তনের ওপরে দাঁত (ভালোবাসা) ১১৭
ভালোবাসা গেছে সুদূর মানস হ্রদে (এসো চোখে চোখে) ২০৪
ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে (ভালোবাসার পাশেই) ১৩
ভালোবাসার জন্য কাঙালপনা আমার গেল না এ-জীবনে (মনে পড়ে যায়) ১৫৫
ভোরবেলায় মুখচ্ছবি কোথায় লুকিয়ে রাখো (ভোরবেলার মুখচ্ছবি) ২৩৭
ভোরে উঠে মুখ দেখি রাজকুমারীর (রাজকুমারী) ৫৩

মধ্যরাত্রির নিরালায় সন্ন্যাসী তাঁর মুখোশটি খুলে (মধ্যরাত্রির নিরালায়) ২৩২
মন ভালো নেই মন ভালো নেই মন ভালো নেই (মন ভালো নেই) ৪৭
মনে আছে সেই রাত্রি ? সেই চাকভাঙা (ছবি খেলা) ৭৪
মনে পড়ে সেই গান (মনে পড়ে) ১৮৯
মনোবেদনার রং নীল না বাদামী (নারী কিংবা ঘাসফুল) ২৯
মাঠ থেকে উঠে ওরা এখন গোলায় শুয়ে আছে (শীত এলে মনে হয়) ৬৮
মাঠের ভিতরে এত পরিশুদ্ধ ঘর বাড়ি, এসব কাদের (খণ্ড ইতিহাস) ২২৩
মাত্র বারো তেরো বছর বয়েস ছেলেটার, বললো, ওর মা, বাবা (দুর্বোধ্য) ১৪২
মাথায় একটা ডাণ্ডা, একটা বুনো শব্দ, শেষ (কেই শুধালো না) ১০৪
মাথার ভিতরে এক কালো দিঘি অতিকায় জলের দর্পণ (জলের দর্পণে) ২১৮
মানুষ যতটা বড় হতে চেয়েছিল (মানুষ যতটা বড়) ১০৫
মানুষ হলো সংখ্যা, আর সংখ্যার তো মন থাকে না (গোল্লাছুট) ১৫২
মানুষের মুক্তি চাই, মুক্তিও মানুষকে খুঁজছে (তিনটি অনুভব) ২০৭
মায়া মমতার মতো এখন শীতের রোদ (একটি শীতের দৃশ্য) ১৫
মায়া যেন সশরীর, চুপে চুপে মশারির প্রান্তে এসে (মায়া) ২২
মায়ের কপট ঘুম, বাপ বাইরে (কাব্যজিজ্ঞাসা) ২৩৪
মেঘের সুপরামর্শে নাবাল জমিতে রোয়া হলো ইরি ধান (কৌতুক) ১৮৮
মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো, শালিকেরা ফেলে যায় খড়কুটো (মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো) ১৫৭

'যতদিন বাঁচবো যেন দু'চোখ খুলেই বেঁচে থাকি' (জন্মান্ধের গান) ১৪
যতদিন পারি আমার নীল পেয়ালায় (বাসনা আমার) ৪৮
যতদিন ছিলে তুমি পরাধীনা ততদিন ছিলে তুমি সবার জননী (জনমদুখিনী) ২৩৩
যদি আর আমি কিছুই না লিখি (তোমার খুশির জন্য) ৭১
যবনিকা সরে যায়, দেখি দূর অন্ধকার স্মৃতির ওপারে (যবনিকা সরে যায়) ১৫৯
যাবার কথা ছিল ফেরার পথ নেই (বেলা গেল) ৪৭
যাবে কি এবার বসন্তেই (প্রবাস) ৭৭

যারা খুব কাছাকাছি তাদের গভীরে যেতে যেতে (কাছাকাছি মানুষের) ১৫৬
যারা বারুদ ঘরে আগুন দিতে গিয়েছিল, তাদের তিনজন (কোথায় গেল, কোথায়) ১৬৪
যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি (যে আমায়) ৮২
যে কিছুই জানে না সে সব-কিছু ভাঙে (যে জানে না, যে জেনেছে) ২১৪
যেই দরজা খুললে আমি জন্তু থেকে মানুষ হলাম (নীরার কাছে) ১০৪
যেন অতিকায় এক সিংহের মতন রূপ (শুয়ে আছি) ৩৮

রাত্রির সমুদ্রতীরে দেখা হবে রাত্রির সমুদ্র (দেখা হবে) ২০১
রাসেল, অবোধ শিশু, তোর জন্য (শিশুরক্ত) ৫৬
রূপনারানের কূলে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম (রূপনারানের কূলে) ১০১

লঙ্গরখানায় একবার আমি তুলে নিই পরিবেশনের হাতা (দ্বিখণ্ডিত) ১৪৫
লন্ডনে আছে লাস্ট বেঞ্চির ভীরু পরিমল (চায়ের দোকানে) ২৫
লাইব্রেরির মধ্যে কেন পড়েছিল অর্ধবোনা উল (লাইব্রেরিতে) ৫৩
লাইব্রেরির মধ্যে এক মৃত্যু (লাইব্রেরির মধ্যে) ৯৫
লোকটি ভীষণ ব্যস্ত এবং অহঙ্কারী (লোকটি) ৬৩

শব্দ মোহ বন্ধনে কবে প্রথম ধরা পড়েছিলুম আজ মনে নেই (দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায়) ১৩৩
শব্দকে তার বাগানটি দাও, শব্দ একলা বন্দী ঘরে (শব্দ আমার) ১০৬
শামুকের মতো আমি ঘরবাড়ি পিঠে নিয়ে ঘুরি (এক জীবন) ৯৭
শাশ্বত সত্যের পাশে দাঁড় করাও তো ঐ ন্যাংটো (কবিতা হয় না) ১৬০
শিমুল, শিমুল, তুই চুপ করে থাক (প্রতিহিংসা) ১১১
শিল্প তো সার্বজনীন, তা কারুর একলার নয় (শিল্প) ১৬২
শিল্পী ফিরে চলেছেন, এ কেমন চলে যাওয়া তাঁর (শিল্পী ফিরে চলেছেন) ১৪
শুয়ে আছে বিছানায়, সামনে উন্মুক্ত নীল খাতা (কবিতা মূর্তিমতী) ৫৫
শুয়োরের বাচ্চারাই সভ্যতার নামে জিতে গেল (মানুষের মুখ চিনে) ৯১
শূন্য খুব বিশাল যেমন পিনের মাথায় শূন্যতা (শূন্যতা) ৫৯
শূন্যে বাজে পাগল ডমরু (শূন্যে বাজে) ২০৮

সকাল নয়, তবু আমার (তোমার কাছেই) ৫৭
সজোরে খিদে পেয়েছিল (খিদে-তেষ্টা) ২৩৭
সদ্য হাসপাতাল থেকে আসছি, সে আবার বেঁচে উঠবে (একজন মানুষের) ১৫৪
সবচেয়ে কী বেশি ভেঙেচুরে, গুঁড়িয়ে (এখন একবার) ৩১
সমস্ত পতন তুচ্ছ করে (ধ্যানী) ৬৪
সাতশো একান্নতম আনন্দটি পেয়েছি সেদিন (সেদিন বিকেলবেলা) ৮০
সামনে দিগন্ত কিংবা অনন্ত থাকার কথা ছিল (কথা ছিল) ২০
সারা দুনিয়ায় এক দুর্নিবার চ্যাঁচামেচি, কেড়ে নিতে হবে (সারা দুনিয়ায়) ৭৫
সিংহাসনে ঘুণ পোকা শব্দ করে (সিংহাসনে ঘুণ পোকা) ২৮
সুখের তৃতীয় সিঁড়ি ডান পাশে (অন্তত একবার এ জীবনে) ২১৬
সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে (নিজের আড়ালে) ১৬
সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না (সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম)১৭৩
সূর্যকে প্রণাম করছে পর্বত, এ দৃশ্য আমি অন্তত একবার (মহতের কাছে) ৩৮
সে ভেবেছে চুপ করে আছি তাই সকলি মেনেছি (চুপ করে আছি) ৬২
সে এত সুন্দর, তাই তার পাশে বসি (সুন্দরের পাশে) ৭৮
সে চেনা রাস্তা পছন্দ করতো না (যোগব্রত) ১৯০

সেই পথ দিয়ে ফিরে যাওয়া (বনমর্মর) ৪৯
সেই লেখাটা লিখতে হবে, যে লেখাটা লেখা হয়নি (সেই লেখাটা) ১৪৯
সেই অন্ধকার পথ ভেঙে যাওয়া, অজস্র জোনাকি, বুকের (কেঁদুলির যাত্রী) ৯৮
স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ (স্পর্শটুকু নাও) ২০৬
স্নেহের ভিতরে কিছু পাপ ছিল (কিছু পাপ ছিল) ৫৯

হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে সেই পাগলটি (আছে ও নেই) ১৮
হাতের মুঠোয় ছিল একটা মস্ত বড় নদী (এখন আমি) ৯৩
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো (এই দৃশ্য) ৯২
হে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ তোমাদের জন্য (হে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ) ১৫৮
হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো (হে পিঙ্গল অশ্বারোহী) ১৫৩
হে মৃত্যুর মায়াময় দেশ, হে তৃতীয় যামের অদৃশ্য আলো (আমাকে জড়িয়ে) ১১৪